**লোকায়ত সমাজে হজরত মহম্মদের ভাব মূর্তি ১৮৫০- ১৯৪৭**

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে সাধারণভাবে মসজিদ বাজার ও কসবাকে কেন্দ্র করে যে শহরতলীগুলি গড়ে উঠেছিল সেই সব অঞ্চলে ইসলামের অধিক বিস্তার ঘটেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন।[[1]](#endnote-2)১ ১৮৫০-১৯৪৭ এই অন্তর্বর্তী কালে হজরত মহম্মদকে কেন্দ্র করে যে সকল লোক সঙ্গীত রচিত হয়েছিল আলোচ্য অংশে তাদের উপর প্রধানত আলোকপাত করা হয়েছে । সেই সময়ে এই সঙ্গীতগুলি গ্রাম বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বটে কিন্তু দুখের কথা এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা এখনো পর্যন্ত হয়নি ।তবে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে হজরত মহম্মদের জীবনীকে কেন্দ্র করে যে সকল আধ্যাত্মিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেখানে এই মহামানবের জীবন ও তাঁর প্রচারিত বানীর উপর গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে । পয়গম্বর হজরত হলেন এই সৃষ্টির আদি অন্ত এবং পথ প্রদর্শক বটে -তিনি যেন এক ক্যারাভানের নেতা।২ আবার কোথাও বা মহম্মদকে একজন কান্ডারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যিনি স্রোতের উপর ভাসমান পুষ্পের মতো আত্মাকে ভব সাগরের পরপারে নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়ে দেন। এই ধরণের জীবনী সাহিত্য গুলি শিরাত নামে পরিচিত।ঔপনিবেশিক শাসনকালের প্রতিকূলতা ও অনিশ্চিত পরিবেশে রচিত এই সাহিত্যে হজরতকে মুসলিমদের সামনে আদর্শ রূপে পরিবেশিত করা হয়েছে।এই শিরাতগুলি শহরাঞ্চলের শিক্ষিত মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল এবং সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে এর বিশেষ সংযোগ না থাকলেও গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষেরা যে সে যুগের সমাজ ও অর্থনীতিতে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল একথা সংশয়াতীত। সেই ক্ষেত্রে সুরেলা বাউল সঙ্গীত গুলি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ছিল বলে গ্রামবাংলার মানুষের মধ্যে তা অধিক জনপ্রিয় হয়েছিল । ঔপনিবেশিক নিষ্পেষণই যে তাদের দুর্দশার কারণ –এই উপলব্ধি গ্রামের সাধারণ মানুষের ছিলনা।মূলত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অপশাসনে কুটীর শিল্পের ধ্বংসের ফলেই এই অর্থনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি হয় । কিন্তু সাধারণ মানুষ এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না। তারা মনে করত ইসলামের প্রকৃত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলেই তাদের এই দুঃখ –এই ছিল তাদের বিশ্বাস ।সীমাবদ্ধ ভাবে হলেও বাংলার মুসলিম জনসমাজে এই আন্দোলনের পরিণতিতে কিছুটা সংস্কার সাধিত হয়।শুধু তাই নয় এই সঙ্গীত গুলিতে তৎকালীন বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থারও এক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ।

লোক সঙ্গীতের বিবিধ রূপ – বাংলার যে সকল লোক সঙ্গীতে মহম্মদের জীবন ও বানীর উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাউল ,জারি, মাইজভান্ডারি এবং মেয়েলি গী*তি।বাউলরা সাধারণভাবে তাদের উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবাদর্শের জন্য প্রসিদ্ধ।কেউ কেউ মনে করেন সংস্কৃত বতুল শব্দ থেকে এই বাউল শব্দের উদ্ভব ঘটেছে,যার অর্থ হল ভাবাবেগে উন্মাদ । ভিন্ন মতে এটি ব্যাকুল শব্দ থেকে উদ্ভূত ; তৃতীয় মতে আরবিক আউলিয়া শব্দ থেকে এর উৎপত্তি ।এই বাউলরা সুফী ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন ।৩ এছাড়া বৈষ্ণব আচার রীতি নীতি ও যে তাদের গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ তাদের সঙ্গীতে পাওয়া যায়।মূলত ষোড়শ শতকে ৪ এই বাউলদের উৎপত্তি হলেও ঊনবিংশ শতক ছিল বাউলদের কাছে এক স্বর্ণময় যুগ।এই সময়েই লালন শাহ (১৮৯১), পঞ্জু শাহের (১৮৫১) এবং লালনের শিষ্য দুদু শাহের মতো বিখ্যাত বাউলদের আবির্ভাব ঘটেছিল । সাধারণ ভাবে কুষ্ঠিয়া ,খুলনা ,পাবনা ,রাজশাহী ,ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেই এই বাউলদের প্রভাব অধিক ছিল।৫ এই বাউলরা সাধারণত সাদা আলখাল্লার মতো বস্ত্র পরিধান করতো এবং একতারা নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গান গেয়ে বেড়াতেন।৬*

ঔপনিবেশিক বাংলায় পয়গম্বর বিষয়ে সচেতনতা জাগরণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করা যায় -তার মধ্যে লোকায়ত ইসলামই গুরুত্বপূর্ণ ।এই আদর্শ স্থানীয় রীতি নীতিকে অধিগত করে নিজেকে আরও সঞ্জীবিত করে তুলেছিল ।এছাড়া যে সময় কালে এই সঙ্গীত গুলি রচিত হয়েছিল সেই সময়কালটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৫০ এর দশকেই বাংলায় বাংলার প্রথম ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা হয় ।এই সময় কালেই সরকারের নতুন শিক্ষা নীতি ঘোষিত হয় ।বাংলার শিক্ষিত মুসলিমরা এই সময় কালে তাদের সম্প্রদায়কে সামাজিক দুর্বলতার হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ।এই সময়ে বাংলার বুকে প্রযুক্তিগত যে অগ্রগতি হয়েছিল ,তার উল্লেখ সেসময়কার বিভিন্ন লোক সঙ্গীতে পাওয়া যায় ( উদা; বাষ্প চালিত জলযান )।বর্তমান আলোচনার সমাপ্তি সময়কাল ১৯৪৭, যা ভারতের স্বাধীনতার বৎসর ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মুঘল শাসনে বাংলায় জমিদারদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে মুসলিম জমিদাররা হিন্দুদের কাছে তাদের জমিদারী বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয় ।৭ এর প্রধান কারণ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত আইন – যার ফলে মুসলিম জমিদাররা বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং পরিণামে তারা তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হন ।৮ আবদুল্লার উপন্যাসে হিন্দু কর্মচারীদের দ্বারা মুসলিম জমিদাররা কিভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ।৯ এই অবস্থায় মানসিক হতাশার হাত থেকে মুক্তি পেতে তারা হজরত মহম্মদের আদর্শকেই আশ্রয় করেন।এবং এইভাবে বাংলায় পয়গম্বর কেন্দ্রীক ভাবধারার বিকাশ ঘটে ।১০ ঐতিহাসিক দৃষ্টি কোণ থেকে এই সময় বাংলার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অ ত্যন্ত জটিল।বাংলার বুকে ব্রিটিশের আর্থিক নিপীড়ণের ফলে তাঁতিরা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।১১ এদিকে ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের ফলে যন্ত্র শিল্পের যে চরম অগ্রগতি ঘটে তার ফলে ভারতে তাঁতিদের পক্ষে মিলের তৈরী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।১২

এই আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির আশায় বেশ কিছু মানুষ ভবঘুরের মতো গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে ।তাদের সঙ্গীতের মাধ্যমে তারা সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য তুলে ধরেছেন।১৩ এই বাউলরা কোন সামাজিক সংস্কারক নন । তারা কেবল মাত্র তাদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন নেতিবাচক বিষয় গুলি মানুষের সামনে তুলে ধরেছিল ।১৪

জারি সঙ্গীত

বিভিন্ন লোক সঙ্গীতের মধ্যে জারি নামক সঙ্গীতের সঙ্গে মদিনার হজরত ইমাম ও হুসেনের মৃত্যুর ন্যায় বিয়োগান্ত ঘটনা জড়িত রয়েছে ।দক্ষিণ এশিয়ার শিয়া সম্প্রদায় মহরমের মাসে কারবালার এই বিষাদময় ঘটনাটি উদযাপন করে থাকেন এবং হুসেন এবং তার অনুগামীদের স্মরণ করে মারসিয়াস বা মৃত্যুগীত গাওয়ার এক রীতি তাদের মধ্যে দেখা যায় । উর্দু ভাষায় রচিত এই মার্সিয়াস সঙ্গীতে কারবালার প্রান্তরে হুসেন এবং তাঁর অনুগামীদের অসাধারণ বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁদের মৃত্যুর নির্মমতাকে মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।১৫ পারসীক শব্দ জারি অর্থাৎ বিলাপ থেকে এই জারি সঙ্গীতের ভাবনার জন্ম হয়। ১৬

কোন এক পণ্ডিতের মতে জারির জন্ম ষোড়শ শতকে – এই সময়কাল ঐতিহাসিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সময় কালে সুফী ধর্ম ও ভক্তিবাদ পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।১৭ বাংলার গ্রামাঞ্চলে আজও একইভাবে জারি সঙ্গীত হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় রয়েছে।১৮ বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সঙ্গীতের বহুল প্রচলন দেখা যায় । মহরমের মাসে কারবালার মরু প্রান্তরে হুসেনের মৃত্যুকে স্মরণ করে তারা এই গান গেয়ে থাকেন।১৯ খুলনা ও যশোরেও এই জাতীয় সঙ্গীতের প্রচলন রয়েছে, ২০ তবে সেখানে এই সঙ্গীতকে ধর্মীয় সঙ্গীত রূপে নয়, মরশুমি সঙ্গীত রূপেই গাওয়া হয়। সেই কারণেই এই সঙ্গীত মহরমের মাস ছাড়া অন্যান্য সময়েও গাওয়া হয়। এক কথায় বলা যায় জারির মূল সুর কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্যেই কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ নয় ।এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর সারা বাংলায় যে সামাজিক - অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল, সেই অর্থে পলাশীর যুদ্ধকে বাংলার কারবালার সঙ্গে তুলনা করা চলে ।২১ এই সঙ্কটে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় একটু আধ্যাত্মিক শান্তির সন্ধানে হজরতের শরণাপন্ন হয়।ঊনবিংশ শতকের জারি সঙ্গীতেও সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই শতকের কৃষক বিদ্রোহ , যা জারি শিল্পীদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তারা তাদের সঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলার আপামর মানুষকে বৃটিশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান ।সেই কারণেই খিলাফত কিংবা অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও এই জারি সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।সাধারণভাবে দুটি প্রতিযোগী দলে বিভক্ত হয়ে সমবেত ভাবে এই সঙ্গীত গাওয়া হয় ।২২ নৃত্য ও বাদ্য যন্ত্র সহকারে যখন এই সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তখন এক অদ্ভুত নাটকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয় ।২৩ এই সঙ্গীত অনুষ্ঠান করার সময় দলের প্রত্যেকটি সদস্যকে দলপতির নির্দেশ অনুসরণ করতে হয় –যিনি ‘বয়তি’ নামে পরিচিত । এই বয়তির পরিচ্ছদ হল সাদা পাঞ্জাবি পাজামা বা লুঙ্গি এবং তাঁর কাঁধে থাকে পাট করা সাদা চাদর ।তাঁর পায়ে থাকে নূপুর ও হাতে খঞ্জনি।২৪

মেয়েলি গীত – মেয়েলি গীতটি গ্রাম বাংলার নারী সমাজে বহুল প্রচলিত এক প্রকারের সঙ্গীত যা সাধারণ ভাবে বিবাহ কিংবা অন্য কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে।এই কারণেই এটি আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত নামেও পরিচিত।২৫ সম্পূর্ণরূপে বহির্জগতের প্রভাব মুক্ত হয়ে বাড়ির অন্দর মহলের ঘরোয়া পরিবেশে মেয়েরা একত্রিত হয়ে এই ধরণের গান করে থাকে।অনেক সময় ‘গীতালু’ বুড়ি নামে পরিচিত একজন বয়স্কা মহিলাকে গান গাওয়ার জন্য ভাড়া করা হয় । সে গানের তালে নানাবিধ শারীরিক অঙ্গভঙ্গিমা ও ঠাট্টা তামাশা করে আসর জমিয়ে তোলে।এই মেয়েলি সঙ্গীতে একই শব্দ ও ধ্বনির পুনরাবৃত্তি দেখা যায় । সরল সাদামাটা এই সঙ্গীত কোন রীতি নীতি মেনে গাওয়া হয়না এবং এখানে কোন বাদ্য যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয়না ।তবে অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলায় প্রচলিত মেয়েলি সঙ্গীতে নিম্নবর্গের মুসলিম সম্প্রদায় কদাচিৎ ঢোলক ব্যবহার করে থাকে ।২৬

মাইজ ভান্ডারি সঙ্গীত

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রামের মাইজভান্ডার হল মারিফতি সঙ্গীতের বিখ্যাত কেন্দ্র ।এই স্থানের নামানুসারে মারিফতি সঙ্গীতকে মাইজভাণ্ডারী সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।২৭ এই সঙ্গীতের গায়করাও ঐ একই নামে পরিচিত হয়ে থাকেন ।মাইজভান্ডারি গায়কদের খ্যাতি চট্টগ্রামের পরিধি অতিক্রম করে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল ।এঁদের মধ্যে সুফী দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।২৮ সুফীদের মতোই তারা কোন একজন ‘মার্শদ’ বা আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ।বস্তুত এর মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই কারণ চট্টগ্রাম ইসলামের অতীন্দ্রিয়বাদী প্রভাবে সমৃদ্ধ এবং বারো জন আউলিয়ার দেশ নামে খ্যাত।এই মাইজভাণ্ডারীদের প্রধান বৈশিষ্ঠ্য ছিল এই যে তারা ধ র্মের ক্ষেত্রে কোন রূপ প্রাতিষ্ঠানিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না । তাদের আসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবের কারণে সমাজের এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষ এঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।এই জাতীয় সঙ্গীতে বিশেষ ছন্দে ঢোলক সহযোগে গাওয়া হত। তবে এই সুরের মধ্যে বিশেষ নতুনত্ব ছিলনা ,বরং ছিল একধরণের একঘেয়েমি ও ছন্দের পুনরাবৃত্তি ।মাইজভাণ্ডারী গায়করা দীর্ঘ কেশের অধিকারী হতেন এবং হুঁকা পানের প্রতি তাদের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল।জারি সঙ্গীতের মতো মাইজ ভান্ডারিতেও সমকালীন সামাজিক বৈষম্যের প্রতিফলন দেখা যায় । তাছাড়া এই সঙ্গীতে সৃষ্টি তত্বের গূঢ বিষয়টিরও যেন আভাষ পাওয়া যায় । ২৯

দিন মজুরের সঙ্গীত –

গ্রাম বাংলার দিন মজুরেরা যখন কোন কায়িক শ্রমের কাজে নিযুক্ত হয় তখন নিজেদের উজ্জীবিত করার জন্য তারা মজুরির কাজ করতে করতেই সমবেত ভাবে এক বিশেষ সুর ও ছন্দের প্রয়োগে যে সঙ্গীত গেয়ে থাকে তাকে দিন মজুরের সঙ্গীত বলা হয় ।দ্বাদশ শতকের সূচনায় নদী ও পর্বতাকীর্ণ চট্টগ্রামে এই ধরণের সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয় ছিল ।এই সঙ্গীতের মধ্যে সে যুগের নানা রূপ সামাজিক বৈশিষ্ঠ্য ধরা পড়ে ।কিন্তু পরবর্তীকালে আধুনিকতার প্রয়োজনে যখন জঙ্গল পরিষ্কার করা হতে লাগল এবং কায়িক শ্রমের কাজে বুলডোজারের মতো বৃহদাকৃতির যন্ত্র ব্যবহার শুরু হল তারপর থেকেই ধীরে ধীরে এই জাতীয় সঙ্গীত তার পূর্বেকার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল ।৩০

বর্ষার সঙ্গীত -

প্রাচ্যের কৃষি প্রধান দেশে যেখানে চাষবাসই হল মানুষের প্রধান উপজীবিকা সেখানে কৃষির জন্য বৃষ্টির জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । অনাবৃষ্টির কারণে যদি চাষবাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় তখন ধর্ম প্রাণ কিছু মানুষ বৃষ্টির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান ।সুরেলা এই প্রার্থনা সঙ্গীতই বৃষ্টির সঙ্গীত নামে পরিচিত।৩১ এই ক্ষেত্রে গ্রামের বেশ কিছু যুবক যুবতী ও বৃদ্ধ সমবেত কন্ঠে গান করতে করতে গ্রামের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াত।বিংশ শতকের প্রথম ভাগে চট্টগ্রামের অধিবাসীরা বৃষ্টির জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা জানিয়ে দেবতার চরণে নানা দ্রব্যাদি নিবেদন করত। কখনো কখনো তারা কঠোর কৃচ্ছসাধনের উদ্দেশ্যে প্রখর রৌদ্রে মস্তকের কোন রূপ আচ্ছাদন ছাড়াই উন্মুক্ত কোন প্রান্তরে সমবেত হয়ে এই জাতীয় প্রার্থনা সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করত।৩২ এই শ্রেণীর সঙ্গীতে সমাজের প্রতিফলন না থাকলেও এর মধ্যে মানুষের ধর্মীয় আবেগের বিশেষ স্ফূরণ ঘটেছে ।

বিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্ব ও মহম্মদের আলোকশিখা-পয়গম্বর তত্ত্বের মূল সূত্রই হল ‘নুর –ই-মহম্মদ’ অর্থাৎ মহম্মদের আলোকবর্তিকা।মুসলিম যুক্তিবাদীদের মতে সৃষ্টিকর্তা আমাদের যে চেতনা বা জ্ঞান প্রদান করেছেন তার সঙ্গে আরও অন্যান্য পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে ক্রম বিবর্তনের পর্যায়ে জন্ম হয়েছে প্রাণী জগতের ।মুসলিম দার্শনিক আল ফারাবি এবং ইবন শিনা স্বর্গীয় জ্যোতি এবং চেতনা বা জ্ঞানের মধ্যে একটা অন্বয় সাধনের প্রয়াস করেছেন এবং তাঁদের এই দর্শন থেকে উদ্ভূত হয়েছে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় সুফি তত্ত্ব। তাঁদের মতে সৃষ্টি কর্তাই এই জ্যোতিকে চেতনার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন। ‘নুর’ হল প্রকৃতপক্ষে সূর্যের আলো –বস্তুত এই সৌর জগতের কেন্দ্রে সে সূর্য রয়েছে তাই হল এই জীব জগতের সকল শক্তির উৎস ।এই নুর তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে সুফীদের নুর-ই-মহম্মদই তত্ত্ব।৩৩ সুফীদের মতে সৃষ্টির বহু আগে থেকেই এই নুর বা স্বর্গীয় জ্যোতি দীপ্যমান।বাংলায় মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই নুর তত্ত্ব বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল ।এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঊনবিংশ শতকে খ্রিষ্টান

মিশনারিদের ধর্মীয় প্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া স্বরুপ এই নুর তত্বের উদ্ভব।বস্তুত এই যুগটিই ছিল ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ ৩৪, যেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন ।ইসলামের অনুগামীরাও পয়গম্বরের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।বাউল সম্প্রদায়ও এই নুর ই মহম্মদ তত্ত্বকে কেন্দ্র করে গান রচনা করেছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তারা পয়গম্বরই যে সৃষ্টির মূল উৎস –এই বিশ্বাসকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন । ৩৫ উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চলের ‘বারেল উইস’ নামে পরিচিত মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায় ও এই একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে নুর ই মহম্মদ তত্ত্বকে প্রচারের আলোকে নিয়ে আসে।৩৬

প্রখ্যাত বাউল লালন সাহের বিভিন্ন সঙ্গীতে পয়গম্বরকে সৃষ্টির সকল শক্তির উৎস রূপে চিত্রিত করা হয়েছে ।এর একটি উদাহরণ দেওয়া হল--- আমার পয়গম্বর হলেন পরপারের কান্ডারি /তাঁর স্মরণ না করলে জপ তপ সবই বৃথা

/তাঁর আদি নেই অন্তও নেই ,তিনিই শুরু তিনিই শেষ /তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে সৃষ্টির প্রকৃতি ও রূপ পরিবর্তন করতে পারেন / তাঁর দিব্য জ্যোতি থেকেই উৎসারিত হয়েছে আকাশ পৃথিবী বায়ু ও জলের /আমাকে বল সেই পয়গম্বরের অধিষ্ঠান কোথায় এবং সৃষ্টির আদিতে তাঁর স্বরূপই বা কি ছিল / যেমন বৃক্ষ ও বীজের সম্পর্ক চিরন্তন সেই রূপ ঈশ্বর ও পয়গম্বর ও পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত / এখন তুমি তোমার যুক্তিবাদী মনকে প্রয়োগ করে ফুল ও বৃক্ষের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ কর /যে মানুষের বোধ শক্তি রয়েছে সে এই সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করে উপলব্ধি করতে পারে যে ঈশ্বরই পয়গম্বরের আকৃতি পরিগ্রহ করেন’ ।লালন কহেন ‘ প্রভুর অসীম কৃপায় সিরাজও দরবেশে রূপান্তরিত হয়েছেন ৩৭ – এই শেষ ছত্র দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ –এই অংশে বলা হয়েছে যে সুফি সন্তের পর্যায়ে উত্তোরণের জন্য একজন দীক্ষা গুরু বা ‘মুর্সীদ’ এর আবশ্যকতা রয়েছে । ৩৮

কোন এক অজ্ঞাত কবির রচিত ‘জহর নামা’ বা বিষ কাহিনী নামাঙ্কিত জারি সঙ্গীতের মধ্যেও এই সৃষ্টি তত্ত্বের আভাস মেলে।সম্ভবত ঊনবিংশ শতক কিংবা তার পরবর্তী কোন এক সময়ে এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল।এই সময়টিকে বাউলদের সুবর্ণ যুগ বলা যেতে পারে ।জারি সঙ্গীত যেমন নুরই মহম্মদ তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বাউলদের মধ্যেও এই ভাবধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।৩৯ জারি সঙ্গীতে যে কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে তার সারমর্ম হল এইরূপ –একদা ঈশ্বরের নির্দেশে দেবদূত গ্যাব্রিয়েল হজরত মহম্মদের দুই পৌত্র ইমাম হাসান ও হুসেনের জন্য দুটি পোশাক নিয়ে আসেন।এই পোশাকের একটির রঙ ছিল নীল এবং অপরটির লাল ।ঈশ্বরের নিকট থেকে গ্যাব্রিয়েল অবগত হন যে পৌত্র নীল পোষাক পরিধান করবেন তাঁর মৃত্যু হবে তীব্র বিষক্রিয়ায় এবং লাল বর্ণের পোষাক পরিহিত পরিহিত পৌত্রের মৃত্যু ঘটবে কারবালার যুদ্ধক্ষেত্রে এবং সে শহীদের সম্মান লাভ করবে । গ্যাব্রিয়েল যখন মহম্মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে পয়গম্বরের প্রিয় কন্যা ফতেমার সঙ্গে তাঁর দেখা হলে ফতেমা তাঁকে ‘ছোট চাচা’ বলে সম্বোধন করলে গ্যাব্রি য়েল অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং ফতেমাকে অনুরোধ করেন তাঁকে ‘বড় চাচা’ বলে সম্বোধন করার জন্য।ফতেমা এই অনুরোধ উপেক্ষা তাঁর পিতার স্ততি করা শুরু করলে গ্যাব্রিয়েল আরও অসন্তষ্ট হন ।উভয়ে তখন নুর ই মহম্মদ তত্ত্বের সুষ্ঠু ব্যাখ্যার জন্য মহম্মদের সমীপে উপস্থিত হন ।৪০ সব শুনে মহম্মদ প্রাঞ্জল ভাবে বুঝিয়ে দেন যে ঈশ্বর সর্বাগ্রে তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং এবং এই সৃষ্টির পর দীর্ঘ দিন তিনি নক্ষত্র রূপে বিরাজমান ছিলেন ;এই নক্ষত্র থেকেই উদ্ভূত হয় তাঁর আত্মার ।এর বেশ কিছুকাল পরে এই নক্ষত্রের আলো থেকেই জন্ম হয় দেবদূতদের –এই আলোই নুর ই মহম্মদ নামে খ্যাত ।গ্যাব্রিয়েলের বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে মহম্মদ তাকে আরও জানান যে তার জন্মের পর যে আলো সে প্রত্যক্ষ করেছিল সেই আলোই হল নুর ই মহম্মদ এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মহম্মদ বয়সে গ্যাব্রিয়েল অপেক্ষা প্রবীন ।৪১

জারির পরবর্তী অংশ জুড়ে বর্ণিত হয়েছে ভবিষ্যত বিপদের আশংকা – মহম্মদ তাঁর দুই পৌত্রের বিয়োগান্ত পরিণতির কথা জানতে পেরে কিরূপে বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন , তাই মর্মস্পর্শী ভাষায় ধ্বনিত হয়েছে জারি গায়কের কন্ঠে ।৪২ এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জারির এই হতাশা ও বিয়োগান্ত সুরের মধ্যে একপ্রকার অস্তিত্ব রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা যে নিহিত রয়েছে তা যে কোন সচেতন শ্রোতা মাত্রেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন ।বস্তুত যে সময়ে এই জারি সঙ্গীত বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল মুসলিমদের মধ্যে, সেই সময় তারা এক অদ্ভুত অস্তিত্বহীনতার আশংকায় ভুগছিল। এই অবস্থায় তারা তাদের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এই নুর ই মহম্মদ তত্ত্বটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিল । নুর ই মহম্মদের প্রশস্তিগানের এই একই সুর লক্ষ্য করা যায় মাইজ ভান্ডারি সঙ্গীতের মধ্যে।ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে জনপ্রিয় এই গানের সুর ও ছন্দ ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।তবে এই জাতীয় সঙ্গীতে নুর ই মহম্মদ ভাবনাটির যথাযথ বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকলেও স্থানে স্থানে অনুবাদের ভ্রান্তির কারণে মূল সঙ্গীতের সুষমা কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ হয়েছে ।আলোচ্য অংশে একটি উদাহরণ তুলে দেওয়া হল ---

‘এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উৎস স্বরূপ যে জ্যোতি বা নুর রয়েছে ,আমি সেই জ্যোতিকে স্বীকার করিনা । যখনই আরবিক শব্দ মিমকে অহদ বা এক এই শব্দের মাঝে বসানো হল তখনই আধ্যাত্মিকভাবে জন্ম হল আহমদ ৪৩ (মহম্মদের আর এক নাম)শব্দ।এই জ্যোতি যেন ইশ্বরের খেলনা স্বরূপ এবং এর মধ্যে লুক্কায়িত রহস্যকে জানা সত্যই দুরূহ ।৪৪ যে হেতু এই রহস্য আমার কাছে অনুদ্ঘাটিত সেই কারণেই আমি অন্তরালে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছি .........মহাসমুদ্রের বুদবুদ আমাকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্তী বিভেদের কথা ভুলিয়ে দেয় ।নুর ই মহম্মদ হল সেই স্বর্গীয় জ্যোতি যার মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছে একাধারে ‘জামাল’ বা স্বর্গীয় পবিত্রতার এবং ‘জামাল’ বা স্বর্গীয় মাধুর্যের ।এগুলি একযোগে ঈশ্বর এবং মহম্মদের অস্তিত্বের পরিচায়ক।আমি ঈশ্বরের বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করতে অক্ষম ।৪৫

মানব ত্রাতা পয়গম্বর

ইসলাম ধর্মের সূচনাতেই এই বিশেষ পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়েছিল –যে কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু বিচার দিবসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে । হাদিসের প্রাচীন সংস্করণে এই কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে ।ইসলামে যে ভয়ংকর দিবসের উল্লেখ রয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে হাদিসের এই দিনে মহম্মদ তাদের পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বলে বিশ্বাস করেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ ।তাদের অন্তরের এই আশাই বাণীরূপ পেয়েছে হাদিসে।কাহিনীটি হল এই রূপ ---বিচারের দিবসে ঈশ্বর মানবকে একটি পর্বতের চূড়ায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন । তাদের এই সমবেত অবস্থাকালীন সময়েই সূর্য তাদের নিকটবর্তী হতে থাকলে তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে ।এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় তারা তখন এমন একজন পরিত্রাতার সন্ধান করতে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে যিনি তাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে দরবার করতে সমর্থ। কিন্তু বিভিন্ন পয়গম্বরের শরণাপন্ন হয়েও তারা ব্যর্থ হন ।সর্বশেষে তারা পয়গম্বর শ্রেষ্ঠ হজরত মহম্মদের কাছে আর্জি পেশ করলে তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের পক্ষ নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদানে সম্মত হন। ৪৬

উল্লেখ্য ইসলামের এই বিশেষ কাহিনীর সঙ্গে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে –যেখানে যীশুকে ঈশ্বর ও মানবের যোগসূত্রক মোজেস অপেক্ষা উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে ।৪৭ এখানে যীশুর ভূমিকাও পরিত্রাতার । সুতরং এই সাদৃশ্য সেই সূক্ষ্ম ধর্মীয় প্রতিযোগিতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে যেখানে ইসলামের অনুগামীরা যীশু ও হজরত মহম্মদের মধ্যে তুলনা টেনে পরোক্ষে ইসলাম ধর্মেরই জয়গান করতে চেয়েছেন । ঊনবিংশ শতকের জাহির আলি নামক এক অখ্যাত বাউলের কণ্ঠেও এই একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে ।৪৮ চিন্তান্বিত জাহির ইসলাম অনুগামীদের উদ্দেশ্য করে বলছেন যে বিচার দিবস অতীব সমস্যা সঙ্কুল ; যদি তুমি নিরাপদে সিরাত সেতু অতিক্রম করতে চাও তবে এখন ই তোমাকে একজন উপযুক্ত মোক্তারের সন্ধান করতে হবে ৪৯ –একমাত্র পয়গম্বরই সেই ব্যক্তি যিনি বিচারের দিবসে ধর্ম বিশ্বাসীদের রক্ষা করতে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করে থাকেন- এইরূপ বিশ্বাস ইসলামের অনুগামীরা করে থাকেন।৫০

মহম্মদ হলেন সেই কান্ডারি বা পথ প্রদর্শক যিনি মৃত্যুর পরে মানবাত্মাকে পথ দেখিয়ে পরপাড়ে নিরাপদে পৌঁছে দেন –এই বিশ্বাস ই ধ্বনিত হয়েছে লালনের গানের বিভিন্ন ছত্রে ঃ তোমার সমতুল্য বন্ধু কেহ নেই /হে পয়গম্বর আমরা যেন কখনো তোমার করুণা থেকে বঞ্চিত না হই/ তুমি ঈশ্বরের মিত্র ও আমাদের কাণ্ডারি /তোমার সাহায্য বিনা আমাদের পক্ষে এই ভব সমুদ্র অতিক্রম করা অসম্ভব /তোমার দিব্য শক্তির প্রভাবে তুমি সর্বদা আমাদের সঠিক পথে রেখো এবং আমাদের জীবনকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে তুমি কখনো আমাদের ত্যাগ করে যেও না /আমরা মদিনাবাসী হলেও অন্তরে বন্য পশুর তুল্য হিংস্র /তুমি আমাদের অন্তরকে আলোকিত কর /তুমি আমাদের যাবতীয় সুখ সম্পদের উৎস স্বরূপ /তোমাকে হারালে আমাদের মতো হতভাগ্য মানুষের পরিণতি কি হবে ?’লালন কহে এইরূপ আলো আর কখনো প্রজ্জ্বলিত হবেনা ।৫১

ভিন্ন এক প্রেক্ষিতে লালনের কন্ঠে –হে মানব পয়গম্বর যদি তোমার জীবন তরণীর কাণ্ডারি হন তবে সে তরণী কখনো নিমজ্জিত হবেনা ।অচলা ভক্তি ও বিশ্বাসই হল এই তরণীর চালিকা শক্তি যা বাতাসের সাহায্য ছাড়াই মসৃণ গতিতে জীবন পথে এগিয়ে চলে অবিরাম গতিতে /যখন শেষ ডাক আসে তখন এই ভালোবাসা দিয়ে তৈরী এই তরণীখানি তোমাকে এই অসীম ভব সমুদ্র পার করে দেয়। লালন বলে ‘মন এটি স্মরণে রেখ এবং সেই মতো কাজ কর’।৫২

বাউল দর্শনে অন্তহীন সমুদ্র বলতে বোঝায় ভবসিন্ধু যাকে অতিক্রম করে মানবাত্মা ঈশ্বরের দরবারে উপনীত হয় ।৫৩ অপার করুণাময় মহম্মদ আবার ‘মুহবুবিয়াত ই খুদা’ বা ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ নামেই খ্যাত । ৫৪ সুতরাং বিশ্বাস দিয়ে তৈরী যে তরণীর কান্ডারি হলেন স্বয়ং মহম্মদ - তার চালিকা শক্তি হল ভালোবাসা। এই উক্তিটির মধ্য দিয়ে লালন কি বোঝাতে চেয়েছেন –সে কথা উপলব্ধি করা খুব একটা কঠিন নয় ।সুতরাং একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে সমগ্র ইসলাম জগতে এই বিশ্বাস নির্মিত তরণীর তত্ত্ব বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং ক্যালিগ্রাফিতেও এর উল্লেখ পাওয়া যায় ।৫৫

মানবত্রাতা রূপে মহম্মদের ভূমিকার উল্লেখ জারি সঙ্গীতেও পাওয়া যায়।মুর্শিদাবাদের মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে ঊনবিংশ শতকে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।এই জারি সঙ্গীতে ফুলচেরাতের জারি বা সিরাত সেতুর জারি নামে পরিচিত ।এর রচয়িতা শ্রী হকনাম নামক এক অখ্যাত অনামা ব্যক্তি। ৫৬ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নবাবির কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ।প্রথমদিকে মুর্শিদাবাদের নবাবরা জারি সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন । পারস্য থেকে আগত এই সকল নবাবরা শিয়া ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং সেই কারণে জারির প্রতি তাদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।৫৭ কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে এই পৃষ্ঠপোষক তার অবসান হয় এবং জারি ধীরে ধীরে গণ সঙ্গীতে রূপান্তরিত হ্য়।এই জেলায় মহরমের মাসে কারবালার বিষাদময় ঘটনার স্মরণে আজও জারি সঙ্গীত গাওয়া্ হয়।৫৮ কারবালার এই ঘটনা পলাশীর যুদ্ধের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যার পরিণতিতে বাংলার প্রাচীন গৌরব ম্লান হয়ে যায় ।মুর্শিদাবাদে জারির জনপ্রিয়তার পেছনে যে সকল কারণ নিহিত ছিল এটি তাদের মধ্যে অন্যতম।

মহম্মদের প্রিয় কন্যা ফতেমাও তার পিতার পাশাপাশি বিচারের দিবসে ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য আবেদন করতেন। বাংলার সুফী দর্শন বা ফকিরি তত্ত্বে ফতেমার যেরূপ গুণ কীর্তন করা হয়েছে তার থেকে তার গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার বিষয়টি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।৫৯ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ জর্জরিত হিন্দুরা যেমন শান্তির আশায় শক্তিরূপিনী কালীর শরণাপন্ন হয়েছিল এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সেযুগে রচিত হয়েছিল বিভিন্ন সঙ্গীত।৬০ ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে গ্রাম বাংলার মুসলিমরাও তাদের ফতেমার মধ্যে সেই মা কালী কেই দেখেছিলেন, যিনি ফকিরি তত্ত্বে মা বরকত নামে পরিচিত ছিলেন ।৬১ বর্তমান অংশে ফুলচেরাতের জারির একটি উদাহরণ দেওয়া হল- ‘বিবি ফতেমা যখন সংবাদ পেলেন যে বিচারের দিনে ধর্মবিশ্বাসীরা নরকে পতিত হয়েছে , তখন তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর করুণা ভিক্ষা করেন ।এমনকি তিনি বিশ্বাসীদের জন্য অশ্রুও বিসর্জন করেন ।অসাধারণ উদ্যমের সঙ্গে মহম্মদ তাঁর অনুগামীদের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হন ।ঈশ্বর মহম্মদের এই ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করে তাঁর দেবদূতদের নির্দেশ দেন যে তারা যেন বিবি ফতেমার সম্মান রক্ষার্থেই উম্মা বা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন।ঈশ্বর মহম্মদ ও ফতেমাকে আশীর্বাদ করে আরও বলেন যে যারা মহম্মদ ও ফতেমার পথ অনুসরণ করবে, তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করবে ,তাঁদের তিনি ক্ষমা করবেন। কিন্তু যারা নিজেদের পয়গম্বরের কদম বা চরণে সমর্পণ করেনি তারা কোনদিনই তাঁর ক্ষমার যোগ্য হবেনা এবং নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করবে না।৬২

সুতরাং গ্রামবাংলার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে যখন কালী এবং অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর প্রাধান্য সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছিল ,সেই সময়ই মানবাত্মার পরিত্রাতা রূপে পয়গম্বরের পুত্রী ফতেমার ভাব মূর্তিকে চিত্রিত করা হয় ।

ঔপনিবেশিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যেখানে সামন্ত প্রথা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়েছিল এবং সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল ।সেই সময় মহম্মদ কিভাবে মুসলিমদের চোখে আদর্শ রূপে পরিগণিত হলেন, সে বিষয়ে বিশ্লেষণ আবশ্যক ।সমা জের বহিরঙ্গের এই পরিবর্তন গ্রাম বাংলার মুসলিমদের আচার ব্যবহারেও আমূল পরিবর্তন দেখা যায় –যা ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধের লোক কবিরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি ।এই শ্রেণির কবিদের মধ্যে নাসিরুদ্দিন৬৩ নামক এক কবির নাম উল্লেখ করা যায় –তিনি গান ধরেছেন—

‘বাংলার মুসলিমরা কোনভাবেই অরন্যবাসী অপেক্ষা উন্নত নয় ।তারা হাদিস কিংবা কোরানের অনু শাসন মেনে চলেনা । বরং তারা সুদের ব্যবসা ঘুষের ব্যবসা ,পরকীয়া সম্পর্ক প্রভৃতিতে মত্ত থাকেন ।এখানে স্ত্রীলোকরা প র্দাপ্রথা অনুসরণ করেনা, তবুও লোকে তাদের হাতের খাদ্য গ্রহণ করে । পুরুষরা এখন শার্টকোট ঘড়ি চশমা পরিধান করেন এবং হুঁকার পরিবর্তে বিড়ি এবং তাম্বুল চর্বন করে। এমন কি তাদের মধ্যে চিরাচরিত তহবান টুপির ও ব্যবহার তারা করেনা’।৬৪

এই সঙ্গীতের সারমর্ম অত্যন্ত স্পষ্ট ।পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার কিংবা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিষয়ে বাংলার মুসলিমরা যে সুন্না বা পয়গম্বরের বিধান থেকে যে বিচ্যুত হয়েছে ,সেই বিষয় টি কবিকে ক্ষুব্ধ করেছে ।৬৫ এই শ্রেণির সঙ্গীতগুলি ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে কিভাবে ঊনবিংশ শতকের শেষে বাংলার মুসলিমরা তাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সংস্কারবাদী ইস লামী ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন পুঁথিতে এই প্রবর্তিত মনোভাবের উল্লেখ পাওয়া যায় ।কোন এক অখ্যাত লেখকের রচিত নাসিহত অল অজম (ময়ম্নসিংহ ১৮৭৫)এবং মুন্সী নবি নাওয়াজ খান রচিত আহকম অল নভি (ঢাকা ১৮৭৫) ।এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে একথা অনুধাবন করা কঠিন কেন ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বিপুল পরিমাণ সিরাত সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে ।

লালনের শিষ্য দুদু শাহের সঙ্গীতের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছে এই ভাবনার প্রকাশ – মুসলিম অভিজাতদের মন থেকে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা দূর করার জন্যও পয়গম্বর বিশেষ প্রয়াস করেছেন ।কিন্তু তাঁর এই প্রয়াসের কোন প্রভাবই বাংলার আত্মমগ্ন সঈদ দের মধ্যে পড়েনি ।কবি বিলাপ করে বলছেন মহম্মদের আদর্শ অনুসারে একজন মহান ব্যক্তি –তিনি যদি মুচির সন্তানও হন , তাহলেও ধর্ম বিশ্বাসী কিছু মানুষকে ধর্মের পথে মার্গ দর্শনের অধিকারী হতে পারেন। কবি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছেন যে বাংলার ‘তথাকথিত বিশ্বাসীরা’ মহম্মদের পথ অনুসরণ করছেন কিনা’।বাংলার উচ্চ বংশ জাত মুসলিমরা ছিলেন অহংকারী এবং সমাজে নিজেদের সঈদ রূপে পরিচয় দিয়ে তারা হজরত মহম্মদের উত্তরাধিকারী রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করত ।এই আশরফরা মুসলিমদের অন্যান্য নিম্ন শ্রেণী বিশেষত ধর্মান্তরিতদের আজলফ বা আতরফ হিসাবে হেয় চোখে দেখতেন।১৯০১ সালের বেঙ্গল সেন্সাসে ৬৬ মুসলিমদের মধ্যে এই জাতীয় সামাজিক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় ।মহম্মদ আরব সমাজের এই চিরাচরিত শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা করেন এবং একই ইসলামের আদর্শে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।৬৭ কিন্তু অজ্ঞতার কারণেই অশরফ ও অতরফদের মধ্যে বিষম্য বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব হয়না ।এই বিষয়ে বিভিন্ন মুসলিম সংস্কারক রা বিশেষ ভাবে সচেতন করে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে এর ফলে বাংলার গ্রামাঞ্চলে বঞ্চিত অতরফরা খ্রীষ্টান মিশনারিদের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে ধর্মান্তরিত হতে পারে এই আশঙ্কা তাদের ছিল ।৬৮

কুলসুমার মেজবানি নামক জারি সঙ্গীতেও বাংলার মুস লিমদের আভ্যন্তরীণ বিভেদের চিত্র সুস্পষ্ট ।কুলসুমের আতিথেয়তা ৬৯ নামক এই সঙ্গীতটি ১৯৫০ সালে কোন এক লোক সঙ্গীত গায়কের কাছ থেকে আবিষ্কার করে ছিলেন কবি জসিমুদ্দিন।৭০ এর রচনা কাল সম্ভবত ঊনবিংশ শতকের কোন এক সময় .।৭১ মহম্মদের দুই কন্যা বিবি কুলসুম এবং বিবি ফতেমা এই দুই বোনকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। কুলসুম ও ফতেমা হলেন মহম্মদের জ্যেষ্ঠা ও কনিষঠা কন্যা ।কুলসুম ছিলেন হজরত আলির স্ত্রী ,তিনি একদা তার গৃহে এক ভোজের আয়োজন করেন যেখানে তার পিতা হজরত মহম্মদও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ।সেখানে উপস্থিত হয়ে মহম্মদ অনুভব করতে পারেন যে কুলসুম প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিনী। তিনি তখন তার এই কন্যাকে পরামর্শ দেন সে যেন দরিদ্র মানুষের মধ্যে এই অতিরিক্ত অর্থ বিতরণ করে দেয় ।পিতার কথায় ক র্ণপাত না করলেও তার স্বামী ওসমান যখন সব বৃত্তান্ত শুনে তাকে এর যৌ ক্তিক্তা বোঝান, তখন কুলসুম সহমত হয়ে তার গৃহে এক বৃহৎ ভোজসভার আয়োজন করেন যেখানে তিনি সমগ্র মক্কাবাসীকে আম্নত্রণ জানালেও তার ভগিনী ফতেমাকে তিনি নিমন্ত্রণ করেননি – ‘ কেবল মাত্র বাদ রবে ফতেমা জোহরা ,তার কাছে পত্র কেহ না দিবে তোমরা’।৭২ উসমান চেষ্টা করেও তার মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারেননা ।কারণ তার যুক্তি হল এই যে বরকত সস্তা দরের এক কাঁথা পড়ে আসবে আমার বাড়ি ,শহরের লোকে লজ্জা আমায় দেবে ঘুরি ঘুরি’।৭৩ মক্কাবাসীর সঙ্গে মহম্মদও কুলসুমের গৃহে উপস্থিত হন । এই ভোজসভায় ফতেমাকে না দেখে তিনি কুলসুমকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে যখন সব ঘটনা জানতে পারেন তখন তিনি কুলসুমকে বোঝান যে এর দ্বারা সে ফতেমাকে অপমান করেছে ।পিতার এই কথায় রুষ্ট কুলসুম তাঁকে অভিযোগ করেন যে পয়গম্বর হিসাবে তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে ফতেমা জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে তার গৃহে উপস্থিত হলে অতিথিদের সম্মুখে তার সম্মানহানি ঘটবে ।ইতিমধ্যে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে – কুলসুমের গৃহের সব খাদ্যবস্তু অদৃশ্য হয়ে যায় ।কুলসুম তখন তার গহনা বিক্রয় করে পুনরায় খাদ্য বস্তু ক্রয় করতে যায় ।কিন্তু সেই গহনাও লোহায় রূপান্তরিত হয়ে যায় ।মহম্মদ তখন কুলসুমকে বলেন ‘ খানা বানায়েছ তুমি বরকতের নিন্দা করে /গজব করেছে আল্লা তোমার উপরে’।৭৪ কুলসুম তখন তার পিতাকে আল্লার ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করায় মহম্মদ জানান যে লাল ও নীল বর্ণের মতো আল্লা ও ফতেমা পরস্পর ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং একই বীজ বা কুঞ্জির অন্তর্ভুক্ত। ৭৫

উপরোক্ত ছত্রের মধ্যে বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণ ভাবের প্রভাব স্পষ্ট ।৭৬ বৈষ্ণব তত্ত্বে রাধা এবং কৃষ্ণের এক আধ্যাত্মিক স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যা চিরন্তন ও শাশ্বত ।কিন্তু তাঁরা দুইজন দুটি পৃথক সত্ত্বায় বিভক্ত হয়ে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার মাধুর্য আস্বাদন করতে চেয়েছেন। ৭৭এই বৈষ্ণব ভাবের প্রতিফলন কেবল জারি সঙ্গীতেই পড়েছে তা নয় ,বাউল সঙ্গীতেও তা ধ্বনিত হয়েছে ।বাউল মতে পরমাত্মার স্পর্শে পয়গম্বর মহম্মদ ,কৃষ্ণ এবং চৈতন্য একই সঙ্গে মানব এবং অতিমানবে রূপান্তরিত হয়েছে। ৭৮ সুতরাং বাউল মতে কৃষ্ণ চৈতন্য মহম্মদ একই ঈশ্বরের স্বরূপ ।রাধা কৃষ্ণের মতো আল্লা ও মহম্মদের সন্তান ফতেমা পরস্পর একই সূত্রে আবদ্ধ । বাংলার ধর্মীয় ক্ষেত্রে দুই নারী শ্রীরাধা ও ফতেমা উভয়েই জনপ্রিয় এবং সম্মানজনক অবস্থানে বিদ্যমান এবং আশ্চর্য নয় যে বাউলরা নিজেদের নারীরূপে কল্পনা করেই প্রকৃত ভালোবাসার স্বরূপ উপলব্ধি করতে চায় ।এই ধারণা থেকেই উদ্ভব হয়েছে হৃদয়ের মানুষ বা সাইনের ধারণা –যিনি আবার সুফী ধারণা অনুসারে চিরন্তন ভালোবাসার মানুষ। ৭৯ মুসলিম কবি ও কাব্যকারদের মতে রাধা এবং কৃষ্ণ যথাক্রমে ফতেমা ও আল্লার প্রতিরূপ।

জারি সঙ্গীতের পরবর্তী অংশে মহম্মদ কুলসুমকে উপদেশ দিয়েছেন যে সে যদি তার ভোজ সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চায় তবে ফতেমাকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে অন্যথায় আল্লাকে সন্তুষ্ট করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।এরপর কুলসুম ফতেমার সামনে উপস্থিত হয়ে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে । মহম্মদের নির্দেশ অনুসারে ফতেমা তাকে ক্ষমা করলেন এই শর্তে যে কুলসুমের সভায় তিনি থাকবেন খাদ্য বস্তুর দায়িত্বে।৮০ ফতেমা এরপর তার পুত্র মদরকে নির্দেশ দিলেন গঙ্গাকে নিয়ে আসার জন্য। ৮১ মায়ের নির্দেশ মতো মদর অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন।৮২ ইসলামে ফকির ও পীর পঞ্জতানি বলে যাঁদের অভিহিত করা হয় তাঁরা হলেন যথাক্রমে মহম্মদ,হাসান ,হুসেন ,ফতেমা এবং আলি ।৮৩ ফকিরদের কাছে এঁরা হলেন পরম পবিত্র এবং ঈশ্বরের প্রতিভূ – এই পাঁচ জন মহান মানুষ অবশেষে কুলসুমের গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।ফতেমার অনুরোধে আল্লা প্রেরণ করলেন গ্যাব্রিয়েলকে এবং তার উপর তিনি কুলসুমের গৃহে সমবেত অভ্যাগতদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণের দায়িত্ব প্রদান করলেন।৮৪

ঊনবিংশ শতকের বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাসে জারির গুরুত্ব অপরিসীম।বিংশ শতকেও যে জারির গুরুত্ব হ্রাস পায়নি তার প্রমাণ ১৯৫০ সালে একজন জারি গায়কদের নিকট থেকে প্রাপ্ত এক সঙ্গীত ।এই সঙ্গীতে মহম্মদের প্রতি কুলসুমের প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশের দ্বারা কবি এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে গ্রাম বাংলার বিত্তশালী মুসলিমরা কিভাবে মহম্মদের পথ থেকে সরে এসেছিল ।

আল্লা মহম্মদের মাধ্যমে মুসলিমদের পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রাত্যহিকভাবে দান ধ্যান করার =যা জাকাত নামে পরিচিত ।৮৫ দরিদ্র ফতেমার প্রতি কুলসুমের উদাসীন মনোভাবের মধ্য দিয়ে কবি বাংলার দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি ধনী মুসলিমদের মনো ভাবকেই বোঝানো হয়েছে ।কবির কল্পনায় বাংলার এই নিঃস্ব মুসলিমরাই অবশেষে জয়ী হল – ফতেমার জয় তাদেরই জয় ।কাহিনীতে কুলসুমের ভাঁড়ার থেকে খাদ্য বস্তু অদৃশ্য হওয়ার বিষয়টিও একটি রূপক মাত্র। আমরা জানি যে ঊনবিংশ শতকের এই পর্যায়ে বাংলা নিদারুণ ভাবে খরা কবলিত হয় ।ফলে উচ্চ বিত্তের মানুষদের এই ভাবে গৃহে খাদ্য বস্তু সংগ্রহ বা সঞ্চয় করার কারণে মানুষের কষ্ট দ্বিগুণ বর্ধিত হয়।লোক কবি কুলসুমের কাহিনী বর্ণনা করে সমাজের উচ্চ বিত্তের মানুষকে আল্লার এই নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ৮৬ তবে মহম্মদ এবং কুলসুমের মধ্যে যে বাক্যালাপ হয়েছিল তার ঐতিহাসিক যথার্থতা নেই বলে অনেকে মনে করেন।

ফতেমার কাছে কুলসুমের ক্ষমা ভিক্ষা এবং তার অনুশোচনা গ্রস্ত মনোভাবের চিত্রণের মধ্য দিয়ে কবি বাংলার ধনী মুসলিমরা দরিদ্র মুসলিমদের প্রতি কি রূপ সহানুভুতিশীল হয়ে উঠেছিলেন তার এক বর্ণনা দিয়েছেন । মহম্মদ সর্বদা অল ফকর ফকিরি শব্দটি উচ্চারণ করতেন যার অর্থ হল দারিদ্র্য আমার অহংকার ৮৭ এবং এই ফকিরি রীতি অনুসারে দারিদ্র্য এবং শক্তি মিলিতভাবে ফতেমার মধ্যে মিশে গিয়েছিল ।এই জারি সঙ্গীতে ফকিরি প্রভাব সুস্পষ্ট যেখানে কবি ফতেমার অলৌকিক ক্ষমতার বা তেলেস মতির উল্লেখ করেছেন । ৮৮ এর ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে ফতেমার চরিত্র চিত্রণ মহম্মদের গুরুত্বকেও ম্লান করে দিয়েছে । পীর মদরকে ফতেমার পুত্র রূপে উপস্থাপিত করে কবি ইতিহাসের প্রতি অবিচার করলেও ফকিরি বা সুফি মতবাদের প্রতি তার ঐকান্তিকতা প্রকাশ করেছেন । হিন্দুদের পবিত্র নদী গঙ্গার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে ফতেমা মূলত ইসলামের লোক ধর্মকেই উ জীবিত করতে চেয়েছেন ।

বাংলার মুসলিমদের বিবাহে অংশগ্রহণকারী নারীদে্র চোখে মহম্মদের ভাবমূর্তি কীরূপ ছিল মেয়েলি গীত থেকে এই বিষয়টি বিশেষভাবে জানা যায় । আমরা জানি যে আধুনিক বাংলায় এমনকি বাংলাদেশেও সদ্য বিবাহিত বর কনের কাছে হস্ত প্রসাধনী বিশেষভাবে জনপ্রিয় ।কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে ও পরিস্থিতি এইরূপ ছিলনা ।সেসময় হস্ত সজ্জা বিশারদদের হাত ও পায়ের পাতা সুসজ্জিত করার জন্য সম্পূর্ণ রূপে মেহেন্দির উপর নির্ভর করতে হত। ৮৯ এই মেহেন্দি অনুষ্ঠানকে একটু ধর্মীয় স্পর্শ দেওয়ার জন্য রচিত হয়েছিল মেয়েলি গীত যেখানে এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে যে রসুলের দরবারেও বহুমূল্যের মেহেন্দি পাওয়া যায় ।৯০ তাই বাংলার বিবাহ অনুষ্ঠানে মেয়েদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় – ‘মহম্মদের বিবাহে যে মেহেন্দি ব্যবহার হয়েছিল তার খোঁজ আমরা কোথায় পাব ? মহম্মদ এবং আল্লার দরবারে এই মেহেন্দি পাওয়া যায়’।৯১

বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করেই নব্বধূ প্রথমে বাড়ির গুরুজনদের সালাম জানায় । এর পরিবর্তে মহিলারা গান গেয়ে নব্বধূকে আশীর্বাদ করে বলেন –‘ ও আল্লা এবং পয়গম্বর এই নব্বিবাহিত দম্পতিকে আশীর্বাদ করুন যাতে তাদের ভবিষ্যত জীবন সুখে অতিবাহিত হয় ।৯২

পূর্বের ই্সলাম অধ্যুষিত দেশগুলিতে বৃষ্টিকে বলা হয় রহমত বা করুণা কারণ এই ঊষর মরুপ্রধান দেশগুলিতে যেহেতু বৃষ্টি হয়না বললেই চলে,সেই কারণে এই সময় ভালো ফসলের জন্য মানুষকে ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করতে হয়।মহম্মদ তাঁর ভক্তদের কাছে ভক্ত বৎসল এবং পরম করুণাময় নামে খ্যাত । ৯৩ সেই কারণে পূর্ব দেশীয় বিভিন্ন কবি মহম্মদকে করুণার মেঘ বা করুণার বৃষ্টি বলে আখ্যাত করেছেন।৯৪ উল্লেখযোগ্য যে এই জাতীয় সঙ্গীতে মহম্মদকে করুণার অবতার ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তু লনা করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে সদ্ধর্ধ পুণ্ডরীক তে বুদ্ধকে পরম করুণাময় বৃষ্টি মেঘ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।৯৫

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এই বৃষ্টির সঙ্গীতে এক নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে।সেখানে সাধারণ মানুষ যারা সুফী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ,তারা বৃষ্টির জন্য বিবি ফতেমার করুণা ভিক্ষা চেয়ে গান গেয়ে থাকেন ।এই অঞ্চলের লোকেরা খরার মরসুমে প্রখর রৌদ্রে মাথায় কোন আবরণ না দিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে সকলে সমবেত ভাবে দাঁড়িয়ে নমাজ পাঠ করেন এবং নমাজ শেষে সমবেত কন্ঠে তারা গেয়ে ওঠেন –‘ আমরা বৃষ্টির রাণীকে আবাহন জানাচ্ছি / আপনার পদ এবং মুখ প্রক্ষালনের পর সেই জল যাতে পৃথিবীর উপর ঝরে পড়ে ,তা আপনি অ নুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন / বিবি ফতেমা জলের অন্বেষণ করছেন , হে ঈশ্বর আপনি কৃপা করে জল দান করুন ।৯৬

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্বে চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলে এই ধরণের বৃষ্টির গানের সন্ধান পাওয়া গেছে ।৯৭ এই সমসাময়িক পর্যায়ে উত্তর পূর্ব চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল বর্তমান অপেক্ষা অধিক ঘন বনানীতে আচ্ছন্ন ছিল।সেইসময় জঙ্গলে যে সব শ্রমিকরা কাঠ কাটার কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের কাঠ সংগ্রহ করে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে কঠোর পরিশ্রম করতে হত ।এই কাজে শা রীরিক ও মানসিক উদ্যম আনার জন্য তারা মহম্মদের নামে সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠত –‘আল্লারি আল্লা হেইয়া আল্লা / মহম্মদ হেঁইয়া দিনভর আল্লা হেঁইয়া / জিন্দা গাজী হেঁইয়া /......।৯৮ এই ছত্রে আল্লারি অ র্থ হে ঈশ্বর , জিন্দা গাজী হলেন প্রবাদের পীর , হেঁইয়া শব্দটি এখনো পর্যন্ত বাংলার শ্রমিকদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয় । এর দ্বারা তারা কাজের উৎসাহ ও উদ্যম সংগ্রহ করে ।

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার মুসলিম সমাজে সংস্কারবাদী ইসলাম কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার এক ছবি পাওয়া যায় বাউল দুদু শাহের সঙ্গীতের মধ্যে ।দুদু স্বয়ং এই পরিবর্তনের বাতাবরণ থেকে যে দূরে সরে থাকতে পারেননি তা তার সঙ্গীতে স্পষ্ট - কোন আইনে মানুষ নিজের সম্পদ ও গহনা বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহের অর্থ উপার্জন করে/ পয়গম্বর ক্ষুধার্ত থাকলে তাঁকেও কঠিন পরিশ্রম করে অন্ন সংগ্রহ করতে হয় /সেই পয়গম্বরের অনুগত হয়ে তুমি কিভাবে গহনা বিক্রয় কর খাদ্য সংগ্রহের জন্য /যেমন ব্রাহ্মণরা ধর্মকে তাদের অর্থ উপার্জনের একটা মাধ্যম বলে মনে করেন।মুসলিমদের এই অধঃপতন দেখে দুদুর দুই চক্ষু অশ্রু সজল হয়ে ওঠে।৯৯

ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম পাদে রচিত অ ন্যান্য বাউল সঙ্গীতেও এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ।বিচারের দিনে অনুগামীদের পক্ষে মহম্মদ ঈশ্বরের কাছে সওয়াল করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন উভয়ের মধ্যে এক যোগ সূত্র ।লালন ছাড়াও অপেক্ষাকৃত অখ্যাত বাউল সাইদ রহমান মহম্মদের উদ্দেশ্যে রচিত সঙ্গীতে বিতর্কিত ‘আহ্বান’শব্দটি প্রয়োগ করেছেন । ১০০ বস্তুত সেযুগে গ্রাম বাংলার প্রতিকূল পরিবেশে আদালতে যাওয়া ছিল এক সাধারণ অভিজ্ঞতা যা সাইদ রহমানের ন্যায় বাউলদের প্রভাবিত করেছিল ।তাই তিনি গেয়েছেন ‘ ......পয়গম্বরের পথ অনুসরণ কর ,হাশরের প্রান্তরে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন ১০১/ কতদিন তুমি সুন্দরী নারীদের মোহে আকৃষ্ট হয়ে থাকবে ? তোমার দরবারে ডাক পড়তে পারে ,সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে পারে /এই হল মুর্শিদের চরণে নিজেকে সমর্পণের প্রকৃষ্ট সময়’-১০২ বাউলদের এই আকুতির মধ্যে বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় ।এই ধারণার উৎস সুফীবাদের পীর মুরিদি বা বৈষ্ণবদের গুরু শিষ্য ধারণা । উভয়ের উপরই সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক পরিকাঠামোর এক গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।১০৩ লালনের সঙ্গীতের প্রতি ছত্রে প্রতিভাত হয়েছে কিভাবে সুদের কারবারীরা চাষিদের উৎপীড়ন করে অর্থ আদায় করত – এই পৃথিবীতে এত ধনী কেউ নেই যে আমি তার কাছে যেতে পারি এবং তার পায়ে পড়ে আমার দুঃখের কাহিনী শোনাতে পারি /যে পুরোহিতদের কথা আমি জানি তারা অর্থের পিছনে ছুটে চলেছে /তারা মানুষের কোন মঙ্গল সাধন না করে কেবল শঠতাই করছে । কবি বলছেন হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা তোমাদের ৠণ কেহই পূরণ করতে পারবেনা /যদি পয়গম্বরকে আবেদন জানানো হয় তবে তিনি সানন্দে সহমত হবেন আমাদের এই ৠণের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ।১০৪

এই অংশে নিহিত বার্তাটি সুস্পষ্ট – লালন নিজে এক কৃষক পরিবারের সন্তান।কাজেই মহাজনদের অত্যাচারে কৃষকরা যে কি নিদারুণ কষ্টে নিমজ্জিত হয়েছিল তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার ছিল। ১০৫ উলেমারাও তাদের উদ্ধারের জন্য প্রস্তুত ছিলেননা ।এই অবস্থায় লালন গ্রামের মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন মহম্মদের কাছে প্রার্থনা জানাতে –লালনের বিশ্বাস, মহম্মদ স্বয়ং সব ভার বহন করবেন ।এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল এই যে এই পৃথিবীতে কোন ঋণ পরিশোধ করা যায়না ।সান্তুনা এই যে পরলোকে মহম্মদ এই ঋণের বোঝা গ্রহণ করেন।ইসলামে সুদের ব্যবসা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবে বহু মুসলিম এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ।কোন এক সিকান্দার রচিত মাইজ ভান্ডারি সঙ্গীতে এই সুদের কারবার সম্পর্কে পয়গম্বরের নিষেধাজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে ।সম্ভবত ইনি সংস্কার পন্থী ইসলাম আদ র্শে প্রভাবিত ছিলেন ---তোমরা তোমাদের গৃহ নির্মাণ করেছ এবং সুদের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পত্তি তোমরা করেছ তা ব্যয় করে যদি তোমরা হজ যাত্রা কর তবে আল্লা এবং পয়গম্বর তোমাদের প্রতি রুষ্ট হবেন’ ।১০৬

উল্লেখ্য ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ১৯৪৩ অবধি বাংলা বিভিন্ন সময়ে খরা পীড়িত হয়েছে । ১০৭ এই প্রেক্ষাপটে বাংলার মানুষের নৈতিক জাগরণের জন্যই সম্ভবত গেয়েছিলেন – ও ভাই আমরা (মহম্মদের মতো ) এমন বন্ধু দেখিনি যিনি কোটি কোটি পীড়িত মানুষের জন্য অশ্রু বিস র্জন করেন / মহম্মদ তাঁর নিজের ক্ষুধা সংযত করার জন্য নিজের পেটে পাথর বাঁধতে বাধ্য হয়েছিলেন । ১০৮ এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য কবিয়ালদের দেখা পাওয়া যায়১০৯ ,কিন্তু আমরা কেবলমাত্র দঃ চট্টগ্রামের কবিয়ালদের কথাই উল্লেখ করব ।এই কবিয়ালরা নাটিয় বা মহম্মদের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন ।এই কবিয়ালদের মধ্যে একজনের সঙ্গে রাজনীতির একটা যোগাযোগ ছিল এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগেই তিনি বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের উষ্ণ সমর্থন লাভ করেছিলেন।১১০ দক্ষিণ চট্টগ্রামের কবিয়ালরা সাধারণত স্থানীয় ভাবে জনপ্রিয় ছিলেন এবং সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে তাদের কোন পরিচিতিই ছিলনা ।এই কবিয়ালরাই মুখে মুখে গান রচনা করে বাংলার অগণিত মানুষকে রাজনৈতিকভাবে উদবুদ্ধ করে তুলত । তাদের কণ্ঠে গীত সঙ্গীত – ওরে ভাই আল্লা এবং পয়গম্বরের নাম নিয়ে শুরু কর /মহম্মদকে স্মরণ করে আমি বিশ্বাসের উপজীবিকা শুরু করি ,যা আমাকে সিরাত সেতু পার হতে সাহায্য করে। আমি তোমাদের বারংবার বলছি আল্লা এবং পয়গম্বরকে মান্য করার জন্য ,অন্যথায় রাজা সমস্যায় পড়লে তোমাকে সেই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে’। ১১১ এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে ঔপনিবেশিক সরকার যখন শাসন ভার গ্রহণ করে তখন দেশীয় রাজারা যার পর নাই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন । এই পরিস্থিতিতে গ্রাম বাংলার কবিরা শান্তির খোঁজে আধ্যাত্মিক জগতের অধিপতি আল্লা ও পয়গম্বরের শরণাপন্ন হয়েছেন।

উপমা বা সাদৃশ্য

মুসলিম শাসনে হিন্দু ও মুসলিমরা দীর্ঘ দিন সহাবস্থানের ফলে তাদের মধ্যে পার স্প রিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।রাজনৈতিক সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সময়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আরও বৃদ্ধি পায় ।ফলে সমাজে সাম্প্রদায়িক মেল বন্ধনের পথ সুগম হয় ।কিছু কিছু লোক গায়ক মহম্মদকে এই সম্প্রীতির উৎস রূপে কল্পনা করেছেন ।মুসলিমরা হিন্দুদের ধর্মীয় আচার ও পৌরাণিক কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই তারা মহম্মদ ও ফতেমাকে বিশেষ কোন হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে উপমিত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে জারি গায়করা মহান

মহান ঈশ্বরের প্রশস্তি করে তাদের সঙ্গীত অনুষ্ঠানের সূচনা করে ।এরপর কাব্যিক ছন্দে তারা তাদের ঐক্যতান বাদনকেও প্রণতি জানায় ।এই দ্বিতীয় পর্যায়ে জারি গায়করা হিন্দু দেবী সরস্বতীর পাশাপাশি পয়গম্বর ও তাঁর প্রিয় কন্যা ফতেমাকে প্রণতি জানায় । ১১২ কোন কোন পণ্ডিতের মতে বাঙালি মুসলিম জারি গায়করা আজও সরস্বতীর প্রশস্তি করে থাকে । জারি গায়কদের বিশ্বাস অনুসারে ঐক্যবাদ্যতানের সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করে ফতেমার সদিচ্ছার উপর এবং এই কনসার্টে ফতেমার একটা প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি যেন লক্ষ্য করা যায় ।ফতেমা কোন সঙ্গীত প্রতিভার অধিকারিনী নন ।কিন্তু বীণা বাদনরতা সরস্বতীর ভাব মূর্তি তাদের এই রূপ আকৃষ্ট করেছিল যে তারা তাঁর এবং ফতেমার মধ্যে একটা যোগ সূত্র কল্পনা করে নেয় ।মনে হয় যেন এই ফতেমা সরস্বতীরই প্রতিরূপ ।১১৩

বাংলার গ্রামাঞ্চলের মুসলিম সমাজ হিন্দুদের অভিনীত যাত্রা ও কথকতায় অংশ গ্রহণ করত এবং এর মধ্য দিয়ে তারা একধরণের মানসিক শান্তি অনুভব করত।পুরানে আছে কোন এক ব্রাহ্মণের নির্দেশে এক রাজা তাঁর পুত্রের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করেন এবং সেটি ব্রাহ্মণকে উপহার স্বরূপ দেন। ব্রাহ্মণের প্রতি এই অসাধারণ সমর্পণ জারি গায়কদের অভিভূত করে এবং তারা এই কাহিনীর অনুসরণে রচনা করেছিল জারি সঙ্গীত জবেরের পুত্রবধ ,যেখানে একই ভাবে মহম্মদের প্রতি উম্মার এই সমর্পণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ।১১৪ বাংলাদেশের বরিশালের বিখ্যাত জারি গায়ক ঘনির সঙ্গীতে এই ছবি পাওয়া যায় ।১১৫ এই সঙ্গীতের রচনাকাল জানা যায়নি ,তবে এটি বিংশ শতকের জারি গায়কের সঙ্গীত সমগ্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই সঙ্গীতটি বিশেষ জন প্রিয় ছিল ।এই সঙ্গীতে বলা হয়েছে একদা আরব দেশের রাজা তার গৃহে পয়গম্বরকে ভোজ সভায় আমন্ত্রণ জানান ।জাবের তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্মুখে একটি ছাগ বলি দিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ।এই সময়

জবেরের কনিষ্ঠ পুত্র তার অগ্রজের কাছে এসে অনুরোধ জানায় সে যেন তার সম্মুখে ছাগ বলির দৃশ্যটির পুনরাবৃত্তি করে ।জ্যেষ্ঠ পুত্র খেলাচ্ছলে তার অনুজকে এই বলিদান পর্বটি প্রদর্শন করতে উদ্যোগী হয় ।কিন্তু অসাবধানতায় সে ছুরি দিয়ে অনুজের গলা কেটে দেয় ।ফলে সারা ঘর রক্তে ভেসে যায় ।এই দৃশ্য দেখে অগ্রজ ভীত হয়ে পড়ে এবং তার মা এই সংবাদ পেয়ে যখন ছুটে আসেন তখন ভীত ছেলেটি পালাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যায় ।এই ঘটনায় মা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং বিলাপ করতে থাকেন ---- স ন্তান হারনোর এই বেদনা আমার কাছে অসহনীয় এবং আমি তৎক্ষণাৎ আত্মহননের নিমিত্ত একটি খ ড়্গ হাতে তুলে নিই ।কিন্তু তখন ই আমার মনে পড়ে যে পয়গম্বর সেদিন তাঁর গৃহে ভোজন করতে আসবেন ।সেক্ষেত্রে তার মৃত্যু সংবাদ শুনলে তিনি অন্ন গ্রহণ না করেই স্থান ত্যাগ করবেন ।সেই কারণে দুই সন্তানের মৃতদেহ কম্বলে আবৃত করে আমি রন্ধন সমাপ্ত করতে মনোনিবেশ করলাম। ১১৬ এমনকি নিজের স্বামীর কাছেও তিনি এই সত্য প্রকাশ করলেন না ।

এর কিছু পরে পয়গম্বর আমাদের গৃহে পদার্পণ করলে তাঁর সম্মুখে খাদ্য পরিবেশন করা হল।গ্যাব্রিয়েলের নির্দেশে পয়গম্বর জাবেরকে তাঁর দুই পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে জাব্রের পত্নী জানায় যে তারা ক্রীড়ারত ।এই উত্তরে সনত্তষ্ট না হয়ে মহম্মদ তাকে জানান যে তার দুই ছেলের অনুপস্থিতিতে তিনি খাদ্যের এক কণাও স্পর্শ করবেন না।বাধ্য হয়ে জাবেরের স্ত্রীকে সত্য প্রকাশ করতে হয় । এই কথা শুনে মহম্মদ তার মৃত দুই সন্তানের দেহ দেখতে চান ।শোকাকুলা মা যখন তার দুই পুত্রের মৃতদেহ থেকে আবরণ সরিয়ে দেন তখন তাদের দেখে তাঁর মনে হয় যেন সূর্য ও চন্দ্র ভূমিতে শয্যা নিয়েছে।১১৭ এরপর মহম্মদ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান এবং অলৌকিকভাবেই জাবেরের দুই পুত্র পুনর্জীবন লাভ করে ।এই দৃশ্য দেখে মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন এবং মহম্মদও প্রসন্ন চিত্তে তাঁর সম্মুখে পরিবেশিত খাদ্য বস্তু ভক্ষণ করেন।১১৮

এই কাহিনীটি আতিথেয়তা বা মেহেমানদারির এক অনবদ্য নিদর্শন –যার উল্লেখ হাদিথে প্রায়শই পাওয়া যায়। হাদিথের প্রতি ঐকান্তিকতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ হিন্দু দেবদেবীর প্রভাব সত্ত্বেও মুসলিম লোক গায়করা দ্রুত ইসলামের কঠোর অনুশাসন বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছিল –যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সংস্কারবাদী ইসলামের প্রভাব ঊনবিংশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথমদিকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

উল্লেখ্য ইসলামে মহম্মদকে ভব কান্ডারি রূপে কল্পনা করা হয় ।এই ক্ষেত্রে হিন্দু

দর্শনের সঙ্গে তার এক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় ।হিন্দুরা শ্রীহরিকে তাদের উদ্ধার কর্তা বলে মনে করে ।এই ভাব নাসিরুদ্দিনের ন্যায় খ্যাতনামা বাউলকেও যে প্রভাবিত করেছিল তা তার গানের ছত্র থেকে স্পষ্ট – যদি কাণ্ডারি শ্রী হরির নাম স্মরণ করা যায় তবে সব সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ।হরির এই তরণী পীড়িত ও পাপীদের উদ্ধারে প্রস্তত্ত ।/তিনি তাঁর নিজ গুণে তাদের পরিত্রাণ করতে সমর্থ /এসো আমার ভাইয়েরা তোমরা যদি শ্রী হরিকে স্মরণ কর তবে তোমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে /যমও ১১৯ তোমাদের সূচাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না ।১২০ নাসিরুদ্দিনের গুরু ফুল ভূষণের সঙ্গীতে আবার মহম্মদকেই কান্ডারী বলে অভিহিত করা হয়েছে ।তবে তাঁর সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত সুর নাসিরুদ্দিনের সঙ্গীতেরই সমতুল্য – হে রসুল তুমি আমাদের মতো ডুবন্ত মানুষের পরিত্রাতা ।আমার তরণী ভেঙে গিয়েছে / তুমি এই ঝড়ের মধ্যে আমাদের নিরাপদে এই সমুদ্র অতিক্রম করতে সাহায্য কর’।১২১ বাউল লালন ও গুরু রূপে পয়গম্বর কৃষ্ণ খুদা এবং শ্রী চৈতন্যকে একাসনে অ ধিষ্ঠিত করেছেন । তার মতে গুরুর মাধ্যম ছাড়া নির্বাণ লাভ করা যায় না । ১২২ বস্তুত ঊনবিংশ শতকে কোন কোন ইসলাম সংস্কারবাদীদের আপত্তি সত্ত্বেও কিছু কিছু ফকির মহম্মদ ও কৃষ্ণের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন । ১২৩ ফলে সংস্কারবাদীরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়।কালীঘাটের কালীমা হয় আলি, হয় ফতেমা –এই সঙ্গীতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল১২৪ কারণ এই জাতীয় সঙ্গীতে কালী এবং ফতেমাকে এক ও অভিন্ন রূপে দেখানো হয়েছে ।এই সঙ্গীতের ভাষা ও রচনা শৈলী দেখে মনে হয় এটি ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ কিংবা তার পরের রচনা ।১২৬

অনুসন্ধান

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসন ভারতের বুকে আরও দৃঢ় ভাবে প্রোথিত হয় ।তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক আধিপত্য গ্রাম বংলার মানুষকে ধীরে ধীরে অনিশ্চতার এক অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় ।এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল খ্রীষ্টান মিশনারিদের দ্রুত প্রভাব বিস্তার ফলে হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই এক অ নিশ্চয়তার মধ্যে দিন যাপন করতে লাগল ।এই পরিস্থিতিতে পরাধীন মানুষেরা নিজেদের অস্তিত্বের অন্বেষণ শুরু করল ।অস্তিত্ত্বের অনুসন্ধানের সূত্র ধরেই ঊনবিংশ শতকের বাংলায় শুরু হল নবজাগরণ ,যার প্রভাবে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী চেতনা জাগ্রত হয় ।এই নবজাগরণ কেবল মাত্র নগর সভ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা , গ্রামের মানুষও এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল ।জ্ঞানের নতুন আলোকে সমৃদ্ধ হয়ে বাংলার লোক সঙ্গীতের মধ্যেও এক নতুন ভাব তরঙ্গ ওঠে এবং অনুসন্ধিৎসার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় । এই মনোভাবের কারণে বেশ কিছু লোক সঙ্গীতশিল্পী গোঁড়া মুসলিমদের দৃষ্টিতে প্রায় ধর্মদ্রোহিতার অপরাধেই দুষ্ট হয়েছেন। ১২৭ বাউলরা হজরত মহম্মদকে হায়াত উল মুরসালিন বলে অবিহিত করেছেন –যার অর্থ হল পয়গম্বরের জীবন।আরবীয় শব্দ মুরসালিন গৃহীত হয়েছে সুর LXXVII থেকে ।এই সুর মুরসালাত বা যারা প্রেরিত হয়েছেন (অর্থাৎ পয়গম্বর) এই নামে অভিহিত হয়েছেন। বাউলরা হজরত মহম্মদের মৃত্যুতে বিশ্বাসী নয় কারণ তাদের মতে হজরতের মৃত্যুর অর্থ হল সত্যের মৃত্যু ।১২৮ যাহোক লোক সঙ্গীতে মুরসালিন শব্দটির ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সংস্কারবাদী ইসলামের উত্তরোত্তর প্রভাব লোক গায়কদের সঙ্গীতকেও কোরান অনুসারী হতে বাধ্য করেছিল ।

ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়ে ছিল মক্কায় এবং প্রকৃতির নিয়মে অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় তিনিও এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন । কিন্তু লালন বিশ্বাস করে যে প্রকৃত পয়গম্বরের মৃত্যু নেই এবং তিনি তাঁর অনুগামীদের মধ্যেই বিরাজমান ।সেই কারণে কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ...তোমাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তোমরা মরণশীল পয়গম্বর এবং মানুষের অন্তরে বিরাজমান পয়গম্বরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার চেষ্টা কর ।১২৯ লালন আরো গেয়েছেন ... যে পয়গম্বর তোমার শরীরে অবস্থান করছেন তাকে চেনার চেষ্টা কর এবংযদি তুমি এই পৃথিবীতে নিরাপদে চলাফেরা করতে চাও তবে দৃঢ় ভাবে মহম্মদের পোষাকের কোণ ধরে রাখ ।১৩০ হাদিথের মতে কুলাব অল মোমেলিন অর্থ আল্লা তালা বা বিশ্বাসীদের হৃদয়ে বিরাজমান ঈশ্বরের সিংহাসন ।বাউলদের মতে কাবা শরীফ প্রকৃত মক্কা নয় ,প্রকৃত মক্কা রয়েছে মানুষের হৃদয়ে।যে পয়গম্বর মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে । কিন্তু একজন প্রকৃত পয়গম্বরের কি কখনো মৃত্যু ঘটতে পারে ?প্রকৃত পয়গম্বর কি কখন ও দেহের অধিকারী হন ? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন বাউলরা ।তাই লালনের কণ্ঠে শুনি সেই গান ---- মদিনাতে একদা মহম্মদ নামে এইজন মানুষ উপস্থিত হলেন /মরণ শীল হয়েও তিনি অব ধ্য / এই পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যাকে মহম্মদের সমতুল্য মনে করা যেতে পারে । ১৩১ এই সঙ্গীতের মধ্যে নিহিত মূল বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধির বিষয় ।অতীতে বহু সুফী সাধক এই সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন ।কিন্তু তারা গোঁড়া মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছেন ।এই জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গিয়ে বাউল মনসুর হাল্লাল নিহত হন ।তিনি বলতেন ---- অনল হক বা আমিই ঈশ্বর বা সত্য ।সেই কারণে বাউল লালন অত্যন্ত সতর্ক ভাবে গান গাইতেন। ১৩২ উল্লেখ্য বাউলরা ঈশ্বর অপেক্ষা মানুষের অধিক জয়গান করেছেন । কিন্তু এই লালনই আবার ভিন্ন জায়গায় গেয়েছেন --- মহম্মদ নিজেই ঈশ্বর ।তাকে ঈশ্বরের থেকে পৃথক করা যায়না । ১৩৩ তিনি পয়গম্বরের জীবন রূপে পরিচিত । অপর এক সঙ্গীতে লালন গেয়েছেন ---- আরবের মহম্মদের দেহ ও ছায়া আছে /তিনি কখনো ঈশ্বর হতে পারেন না ।১৩৪

এখানে লালন দুইজন পয়গম্বরের উল্লেখ করেছেন –একজন হলেন প্রকৃত পয়গম্বর বা হায়াত উল মুরসালিন ,যিনি সকল পয়গম্বরের জীবনী শক্তি ; অপরজন হলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ,আরবদেশের পয়গম্বর ।শরিয়তে কিন্তু পয়গম্বরের দুইটি ভাব মূ র্তির উল্লেখ নেই ।বাউল দর্শন অনুযায়ী হৃদয়ের মানুষ হলেন একজন চিরন্তন মানুষ যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের প্রতিটি কণায় ছড়িয়ে আছেনএবং যাকে কোন ভাবেই ঈশ্বরের থেকে পৃথক করা যায়না ।এই ভাবনার মধ্যে সুফী দ র্শ নের একটা ছায়া লক্ষ্য করা যায় । ১৩৫ বাউলদের কাছে এই শেষোক্ত পয়গম্বরের তাৎপর্য্য ঐতিহাসিক পয়গম্বর অপেক্ষা অনেক বেশী ।এই পয়গম্বরের প্রতি ভালবাসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের আরো সমীপে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন ।বাউলরা এই প্রকৃত পয়গম্বরকে হায়াৎউল মুর্সালিন নামে অভিহিত করেন যার অর্থ হল ইসলামের ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে যে বিভিন্ন পয়গম্বর আছেন হজরত মহম্মদ তাদের অন্যতম। চিন্তাধারার গতি প্রকৃতি ইঙ্গিত করে যে গ্রাম বাংলায় পয়গম্বর কেন্দ্রীক আধ্যাত্মিক ভাবধারার বিকাশ ঘটেছিল ।

লালনের অপর একটি সঙ্গীতর প্রতি যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় তবে দেখা যাবে যে তার গানের প্রতিটি ছত্রে শরিয়তের কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ১৩৬ ---

‘ যদি শরিয়তই নির্বাণের একমাত্র পথ হয় তবে লালন কেন দীর্ঘ ১৫ বছর

হীরার গুহায় ধ্যান মগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন ।ক্তহিত আছে যারা প্রার্থনা করেনা ,উপবাস ব্রত পালন করেনা , অন্তিম বিচারের দিনে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয় ।কিন্তু একথা স্মরণে রাখতে হবে যে তাঁর জীবনের প্রথম ৪০ বছর হজরত মহম্মদ কোন প্রা র্থনা অনুষ্ঠান করেননি’।এই সঙ্গীত থেকে উপলব্ধি করা যায় যে বাউলদের মধ্যে কোরান হাদিথ এবং পয়গম্বরের গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও বাউলরা সর্বাংশে শরিয়তের বিধান মান্য করে চলতে পারেন নি । ১৩৭

নাসিরুদ্দিনএর সঙ্গীতেও মিরাজ বা মহম্মদের স্বর্গ যাত্রার সত্যতা নিয়ে পরোক্ষভাবে প্রশ্ন উত্থিত হ্যেছে ...’আমি যতদূর জানি পয়গম্বরকে ঈশ্বরের পৃথক করা যায়না দুধ ও মাখনের মতো তারাও পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। যদি ইহা সত্য হয় তবে আমাকে বল কেন মহম্মদের পক্ষে মিরাজ বা নৈশ যাত্রা জরুরী হয়ে পড়েছিল। ১৩৮

টীকাকারদের মধ্যে অধিকাংশ ই এই নৈশ যাত্রা বা মিরাজকে আক্ষরিক অ র্থে গ্রহণ ক রেছেন । ১৩৯ কিন্তু বাউল কবি প্রশ্ন তুলেছেন যদি মহ ম্মদ ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন হয় ,তবে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মহম্মদের নৈশ যাত্রার কোন প্রয়োজন ছিলনা ।বাউলদের মধ্যে মীর ই মহম্মদি ভাবধারার জনপ্রিয়তা ইঙ্গিত দেয় যে তারা সুফী দর্শ ন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন । তারা বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর তার নিজের আলো দিয়ে মহম্মদকে তৈরী করেছেন। এই প্রচলিত ভাবাদর্শে বিশ্বাসীরাই মনে করেন যে ঈশ্বর এবং মহ ম্ম দের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন র‍য়েছে । বাউলরা আরো মনে যে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র স্পর্শে মহম্মদকে ধন্য করেছেন ।এই অবস্থায় বাউলদের পক্ষে মিরাজের তা ৎ প র্য বিশ্বাস করা ক ঠিন । লালনের শিষ্য দুদু শাহের আবি র্ভাব হয়েছিল ঊনবিংশ শ্তকের মধ্যভাগে কিংবা তার পরবর্তী কোন এক সময়ে । সেই সময়ে মোল্লা বা মৌলবিরা সঙ্গীত চর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল । তিনি যে এই ফতোয়ার বিরোধী ছিলেন তার ইঙ্গিত তার সঙ্গীতে পাওয়া যায় ১৪০---‘ পয়গম্বর যখন মেদিনায় প্রবেশ করলেন ,তখন বীণা বাজিয়ে তাকে স্বাগত জানানো হয়েছিল ।সেক্ষেত্রে এই ফতোরার কি অন্য কোন উৎস আছে এই প্রশ্ন তুলেছেন দুদু শাহ । ১৪১ ভিন্ন এক প্রসঙ্গে দুদু গেয়েছেন –মিরাজের সময় পয়গম্বর পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কিভাবে সম্ভব ।হাদিথের বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বর কায়াহীন এবং আকৃতি বিহীন হওয়ায় তাঁর অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ কিছু নেই । সেক্ষেত্রে পয়গম্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তার সিংহাসনে আরোহণের প্রয়োজন কি ।১৪২ এই উক্তির মধ্য দিয়ে বাউল কবি পরোক্ষে মহম্মদের সশরীরে স্বর্গ যাত্রার সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । উল্লেখ্য বহু ইসলাম ধ র্মানুগামীরা এই স্বর্গ যাত্রাকে আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করে থাকেন ।১৪৩

**পরিবর্তিত ভাবমূর্তি**

**মধ্য যুগে ইসলাম যখন প্রভূত বিস্তার লাভ করেছিল, সেই সময়ে যে বিভিন্ন সাহিত্য রচিত হয়েছিল সেখানে হজরত মহম্মদের বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয় । নুর ই মহম্মদ, মিরাজ প্রভৃতি যেসকল বিষয়ের সঙ্গে মহম্মদের জীবনের যোগ সুত্র রয়েছে তার উল্লেখ ত ৎ কালীন সাহিত্যে দেখা যায় । ১৪৪ বস্তুত সেই সময়ে যে ধরণের সামাজিক রাজ নৈতিক পরিস্থিতি ছিল সেই প্রেক্ষাপটে ইহজাগতিক মানবতাবাদ অপেক্ষা পরজাগতিক অপরাবাদের প্রাধান্য ও চর্চা অধিক মাত্রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল ।কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রেক্ষাপটের যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার প্রভাব লোক সং স্কৃতির উপর ও পড়ে এবং লোক গায়করা ও তাদের সঙ্গীতে পরা ও অপরা জগৎ কেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে গান রচনা করতে শুরু করে । বাউল পুঞ্জু শাহের সঙ্গীতে এই ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় – ‘ যদি মানুষের দেহকে সঠিক ভাবে খুঁজে দেখা হয় তবে দেখা যাবে যে সেখানে মানুষের জীবনকে আলোকিত করতে নুর ই মহম্মদ ই বিরাজ করছে’ ।১৪৫ এই সঙ্গীতে নুর তত্ত্বের সঙ্গে নৃতত্ত্ব কেন্দ্রীক ভাবের মেল বন্ধন ঘটেছে ।**

**ভিন্ন এক প্রসঙ্গে অখ্যাত এক বাউল গান গেয়েছেন –ঐ বাষ্প চালিত জলযানটি ধর, যেখানে পয়গম্বর হলেন যাত্রী ঈশ্বর স্বয়ং হলেন তার প্রবেশপ্ত্র দাতা বা টিকিট মাস্টার ।১৪৬ এই সঙ্গীতের সময়কাল জানা যায় নি ।কিন্তু একথা মনে করা অযৌক্তিক নয় যে এটি ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে রচিত হয়েছিল ,যখন গঙ্গা দিয়ে নিয়মিত ভাবে স্টীমার বা বাষ্প চালিত জলযান চলাচল করত । ১৪৭ এই বিষয়টি মধ্যযুগে ছিলনা এবং এটিকে আধুনিকতার এক প্রতীক বলা যেতে পারে ।এই সঙ্গীতের অপর তা ৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এই যে এখানে হজরত কে কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী না চিত্রিত করে সাধারণ যাত্রীর মতো এই পৃথিবীর মানুষ রূপেই দেখানো হয়েছে ।এই ক্ষেত্রে মহম্মদ হলেন একজন আদর্শ বন্ধু যিনি তাঁর অনুগামীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তারা যেন তাদের পরলোকের জীবনকে নিশ্চিন্ত করার জন্য এই প্রবেশপ্ত্র সংগ্রহ করে । এই প্রবেশপ ত্রের বিষয়টিতেও নতুনত্ব রয়েছে ।এর মধ্য দিয়ে কবিরা সাধারণ মানুষকে এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোয় যে নতুন আইন প্রবর্তিত হয়েছে তার সঙ্গে সাধারণ মানুষ যেন নিজেদের মানিয়ে নেন ।অপর এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে তারিখ ই মহম্মদিয়া আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ নৃত্য ও সঙ্গীতের বিরোধী ছিলেন। এর প্রতিবাদ স্বরূপ তারিখ ই মহম্মদিয়া ঊনবিংশ শতকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ।ধ র্মীয় রোষ**

**থেকে বাঁচবার জন্য বাউলরা এক নতুন নীতি গ্রহণ করলেন ।তারা তাদের গানের মূল সুরকে অ পরিবর্তিত রেখে কিছু কিছু শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন ।উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কাশী বৃন্দাবনের পরিবর্তে তারা মক্কা শব্দটির উল্লেখ করেছেন এবং কৃষ্ণের স্থানে তাঁরা মহম্মদকে বসিয়েছেন ।১৪৮ যেসব লোক গায়করা মহম্মদকে অবজ্ঞা করে মুর্শিদকে তাদের পথ প্রদর্শক বলে বিশ্বাস করতেন ।পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারাও গেয়ে ও ঠে ‘পয়গম্বর ছাড়া কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবেনা’ । ১৪৯ এমনকি যে লালন শরিয়তি নিয়ম নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনিও গেয়ে উঠেছেন ‘যে ব্যক্তি কান্ডারি পয়গম্বরকে স্বীকার করেনা তারা অন্ধ ।১৫০ তাঁর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন ,উপবাস দান ধ্যান প্রার্থনা তী র্থ যাত্রা প্র ভৃতি পন্থা অনুসরণ করেই নি র্বাণ লাভ সম্ভব । কিংব্দন্তী কবি লালন শাহ ইসলামের পাঁচটি অনুশাসনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন ,যা প্রমাণ করে যে গ্রাম বাংলায় সংস্কার পন্থী ইসলামের প্রাধান্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল ।১৫১ এর প্রভাবে গ্রাম বাংলায় বিশ শতকের জারি সঙ্গীতে হিন্দু দেবী সরস্বতীর পরিবর্তে হজরত কন্যা ফতেমার গুণ কীর্তণ করার রীতি লক্ষ্য করা যায় ।**

ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোয় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ধীরে ধীরে ভূস্বামীদের সমর্থন হারিয়ে ফেলায় ব্যক্তিগতভাবে ভক্তজন পাদ প্রদীপের আলোয় চলে আসে এবং আধ্যাত্মিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের এক উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় ।এই সময়ে রচিত বিভিন্ন সঙ্গীতে মহম্মদকে আদর্শ ও পরিপূর্ণ মানব রূপে চিত্রিত করা হয়েছে ।এই ধরণের বেশ কিছু সঙ্গীত কালক্রমে মানুষের মুখে মুখে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । ফলে এদের আদি ও অবিকৃত রূপ জানা প্রায় অসম্ভব।এই সকল সঙ্গীতগুলির ঐ তিহাসিক যথার্থতা নিয়ে অবশ্য সংশয় রয়েছে ।এমনই এক সঙ্গীতে মদরকে ফতেমার পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।এই সঙ্গীতে ফতেমা ও গঙ্গার মধ্যে সখ্যতার উল্লেখ ও করা হয়েছে ।এই সঙ্গীত গুলিতে মহম্মদকে হরি বা কৃষ্ণের প্রতিরূপ রূপে কল্পনা করা হয়েছে ।তাছাড়া হিন্দু দেব দেবীর কিছু কিছু বৈশিষ্ঠ্য মহম্মদ ও ফতেমার মধ্যে আরোপ করা হয়েছে ।এই সহাবস্থান ও মেলবন্ধন ই লোকায়ত সমাজে ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি করে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে ।যথার্থ ই আধুনিক বঙ্গের (বাংলাদেশ ও এর অন্তর্ভুক্ত )ইসলামিক সংস্কৃতির অভিভাবকদের এই সকল লোক কবিদের থেকে শিক্ষনীয় বহু বিষয় রয়েছে ।

**সূত্র নির্দেশ**

১ Gustava Edward Von Grunebarm , Modern Islam : The Search for Cultural Identity ,

Berkelay 1962 , rpt 1983 p 17 ; M Mujeeb , Indian

Muslims , London , 1967 , 1st Indian ed ,New Delhi 1985

,p10 .

২ Jalaluddin Rumi (d.1273 ) Diwan –I – Kabir ya Kulliyat –I – Shams , ed by Badru zzaman Furuzanfar ,

Tehran University 1957 , Divan no ,463 ; Also see Abdur Rahman Jami (d.1492 ) Haft Aurang , ed by Aqa Murtaza and Mudarris Gilani ,2nd edition , Tehran 1972 ,p 754 quoted in Schimmel , Muhammad Is His Messenger p215 .

৩ Karim , Bauls of Bangladesh p 10 .

৪ Edward C Dimock ,Jr . The Place of Hidden Moon , Erotic Mysticism In The

Vaishnava Sahajia Cult of Bengal , Chicago , 1966 ,pp 249-

270 .

৫ Karim Op cit , p10

৬ ,, Do p 168

৭ Amalendu De Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal Cal 1974

p16.

৮ Rafiuddin Ahmed The Bengal Muslims , A Quest for Identity ,2nd ed Delhi 1988

p11.

৯ আবদুল কাদির ইমদাদুল হক রচনাবলী প্রথম খন্ড ,ঢাকা ১৯৬৮,পৃ

৬৯-৭০;আবদুল্লা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়১৯২০সালে

১০ ঐ তদেব পৃ ১১৬-১১৭

১১ Abhijit Dutta Muslim Society In Transition , Titumeer’s Revolt (1831) A

Study , Calcutta 1986 ,pp 119-140 B D Metcalf ,Islamic Revival

in British India , Deoband 1866-1900 ,Princeton 1982 p9-10 .

১২ Dutta Titumeer’s Revolt pp119-121 .

১৩ Karim Bauls of Bangladesh pp68-78

১৪ ibid do pp 68 – 78 .

১৬ Muhammad Abdul Hai Folk Songs of East Bengal in Shamsuzzaman Khan ed

Folk Lore of Bangladesh vol-1 Dhaka 1987,pp308-309

১৭ Eaton Rise of Islam pp 227-288

১৮ এস এম লুতফার রহমান বাংলাদেশি জারি গান, ঢাকা, ১৯৮৬,পৃ১৭,২১।

১৯ ঐ তদেব পৃ ৩৬ মহরম হল চান্দ্র বর্ষের প্রথম

মাস যে সময়টি কারবালার শহিদদের

উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে ।

২০ ঐ তদেব , পৃ ৩৬,৩৭ ।

২১ ঐ তদেব ,পৃ ১৯

২২ ঐ তদেব ,পৃ ৫-২০ ।

২৩ রহমান তদেব , পৃ ২৬-২৭ ।

২৪ ঐ তদেব পৃ ২৮-২৯।

২৫ মহম্মদ সিরাজুদ্দিন বাংলাদেশের লোক সঙ্গীত পরিচিতি ,ঢাকা,১৯৭৩

কাশিম পুরী পৃ ২৮২-২৮৯

২৬ ঐ তদেব

২৭ ওয়াহিউল আলম চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য,ঢাকা ১৯৮৫, পৃ ১৮-৩৯।

২৮ ঐ পৃ ৩৩

২৯ ঐ তদেব

৩০ আলম প্রাগুক্ত পৃ ৮৯

৩১ আলম লোক সাহিত্য পৃ ৯১

৩২ ঐ তদেব

৩৩ Schimmel, Muhammad Is His Messenger pp 123-143,Asim Roy

Islamic Syncretistic Tradition pp 114 , 115, 121 .

৩৪ Abhijit Dutta Nineteenth Century Bengal Society And

The Christian Missionaries Calcutta 1992

৩৫ Abu Rashid Songs of Lalan Shah ,Dhaka ,1964 ,Introduction

গ্রাম বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব সম্পর্কে লালন

বিশেষ ভাবে অবহিত ছিলেন ।বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে

যীশুর মাধ্যমে এই পৃথিবী সৃজনের তত্ত্ব লিখিত আছে ,

দ্রষ্টব্য Wolfhart Pannenberg ,Jesus God And Men

1st English translation ,London ,1968 .

সম্ভবত গ্রামাঞ্চলে প্রচারের সময় মিশনারিরা যীশুর এই

ভাব মূর্তিকে জনপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন ।এর

বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাউলদের মতো লোকগায়করা

নুর ই মহম্মদ তত্ত্বকে জনপ্রিয় করতে আগ্রহী ছিলেন ।

৩৬ Metcalf Islamic Revival ,pp 296 – 301 .

৩৭ Abu Rashid op cit p13

৩৮ মহঃ আবু তালিব লালন শাহ ও লালন গীতিকা প্রথম খণ্ড ঢাকা ১৯৬৮

ভূমিকা অংশ

৩৯ রহমান প্রাগুক্ত পৃ ১৪৪

৪০ ঐ পৃ ১৪০-১৪৫

৪১ ঐ তদেব

৪২ ঐ পৃ ১৪০

৪৩ A Schimmel Mystical Dimentions of Islam ,Chapel Hill

1975 ,p 419 .

হাদিথে উল্লিখিত আনা আহমদ বিলা মিমশব্দটিতে

মিম এই শব্দটি ঈশ্বর ও হজরতের মধ্যবর্তীব্যবধান।

৪৪ আলম চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য পৃ ২৯-৩০ ।

৪৫ আহদ বিন হাফিজ ও

মুকুল চৌধুরী (স ম্পা) রসুলের সনে কবিতা ,ঢাকা ,১৯৯৬ ।

৪৬ Schimmel Muhammad Is His Messenger p 84 .

৪৭ Henry Barclay Swete The Ascended Christ : A Study In The

Earliest Christian Teaching ,London 1911,p88

৪৮ Abdullah Yusuf Ali The Holy Quran Text, Translation And

Commentary, 3rd ed ,Jeddah,1938, p782

উল্লেখ্য জীবন ও মৃত্যুর মাঝে এক সেতু কল্পনা করা

হয় যাকে মুসলিমরা সিরাত সেতু বলে আবার বাংলা

সাহিত্যে তাকে পুলসিরাত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কোরানে এর ই উল্লেখ রয়েছে ।

৪৯ কাশিমপুরী প্রাগুক্ত পৃ ৪৩৫ ।এখানে জাহির আলি নামক

পূর্ববঙ্গের নেত্র কোণার এক সুফি সাধকের কথা বলা

হয়েছে যিনি তাঁর জীবনের শুরুতেই সঙ্গীত ও নৃত্যে

পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন ।তিনি বেশ কিছু গান রচনা

করেছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্বে সাধকের ন্যায় জীবন

যাপন করতেন।

৫০ ঐ তদেব উল্লেখযোগ্য যীশুকে নিউ টেস্টামেন্টে মানবের ত্রাতা

রূপে চিত্রিত করা হয়েছে ; দ্রষ্টব্য Acsended Christ p 88

৫১ Abu Rashid Op cit p 12

৫২ ibid p 76

৫৩ Harendra Chandra Paul Origin of the Bauls and their Philosophy in

Shamsuruzzaman Khan ed Folk Lore of

Bangladesh vol 1,Dhaka 1987, p 272 .

৫৪ Schimmel op.cit p290

৫৫ Abdel Kebir Khatibi and The Splendour of Islamic Calligraphy,translated

Mohammad Sijelmassi by James Hughes ,New York ,1977,p 243.

৫৬ পুলকেন্দু সিনহা মুর্শিদাবাদের লোকায়ত সঙ্গীত ও সাহিত্য ,প্রথম খন্ড

কলকাতা ,১৯৭১ ,পৃ ১১৫ ।

৫৭ M A Khan History of The Faraidi Movement in Bengal 1818-1906

Karachi ,1965 , Introduction .

৫৮ সিনহা প্রাগুক্ত পৃ ১০৭-১০৮

৫৯ আবদুল কাদির প্রাগুক্ত পৃ ৯,১০

৬০ ১৯৯৭ সালের ২৫এ ফেব্রুয়ারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দুমতী হলে অ ধ্যাপক তপন রায় চৌধুরী প্রদত্ত রাম প্রসাদ বিষয়ক বক্তৃতার অংশ থেকে গৃহীত ।

৬১ Mohammad Saidur (ed) Bangla Academy Folk Lore Sankalan , vol 49,Dhaka

1988 ,pp 100-101 .

৬২ সিনহা প্রাগুক্ত পৃ ১১৫-১১৬

৬৩ আহমদ সরফ বাউল কবি ফুলভূষণ ও নাসিরুদ্দিনের পদাবলী

ঢাকা ১৯৮৮, ভূমিকা ।

৬৪ ঐ তদেব

৬৫ বুরহানুদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বাউল গান ও দুদু শাহ ঢাকা ১৯৬৫ পৃ ৪

(সম্পাদিত)

৬৬ Roy Islamic Syncretistic Tradition p 59

৬৭ , ibid

৬৮ মহম্মদ আবদুল্লা (স ম্পাদিত) মুসলিম সম্পাদিত বাংলা সাময়িকীপত্রে ধ র্ম

ও সমাজচিন্তা ।

৬৯ মেজবানি শব্দটির উদ্ভব পারসিক মেজবানি শব্দ থেকে ,যার অর্থ আতিথেয়তা দ্রষ্টব্য

Standard Twentieth Century Dictionary compiled by B A Qureshi Delhi p 627

৭০ জসিমুদ্দিন জারি গান ঢাকা ১৯৬৮ পৃ ৪১

৭১ রহমান বাংলাদেশি জারি গান পৃ ১২৪

৭২ ঐ তদেব পৃ ১৩০

৭৩ ঐ , , পৃ ১৩১

৭৪ ঐ , , পৃ ১৩৫

৭৫ ঐ , , পৃ ১৩৬

৭৬ ঐ , , পৃ ১২৬

৭৭ Dimock Place of the Hidden Moon pp 138-139

৭৮ Karim Bauls of Bangladesh p116

৭৯ , , ibid

৮০ রহমান প্রাগুক্ত পৃ ১৩৭

৮১ ঐ তদেব পৃ ১২৬; ফকিরি তত্ত্ব অনুসারে

মদর ছিল মা বরকতের সন্তান এবং

গঙ্গা ছিল মদরের অধীন

৮২ ঐ তদেব

৮৩ Roy op.cit p213 it is Shiya influence .

৮৪ জসিমুদ্দিন প্রাগুক্ত পৃ ৪৪

৮৫ কোরান ২:৪৩

৮৬ P A Wadia and K T Merchant Our Economic Problem Bombay

1943 ,p55 ; ভবানী সেন নির্বাচিত

রচনা সমগ্র খন্ড ২ কলিকাতা ১৯৭৭

পৃ ২৭-২৯

৮৭ Paul Origin of the Bauls p 274

৮৮ জসিমুদিন প্রাগুক্ত পৃ ৪৫

৮৯ কাশিমপুরী প্রাগুক্ত পৃ ২৯৮

৯০ ঐ তদেব

৯১ ঐ তদেব

৯২ ঐ তদেব পৃ ৩২৬

৯৩ Sura 21:107 Muhammad was sent as mercy of God

৯৪ Schimmel op.cit p 81

৯৫ , , ibid

৯৬ আলম চট্টগ্রামের লোক সাহিত্য পৃ ৯১

৯৭ ঐ তদেব

৯৮ ঐ তদেব পৃ ৮৯

৯৯ জাহাঙ্গীর দুদু শাহ পৃ ৪৮-৪৯

১০০ আবু রশিদ লালন শাহ পৃ ৩

রহমান আক্রম খান পৃ ২৮

১০১ হসর বলতে বোঝায় সমাবেশ Sura LIX. এঈ বিশ্বাস অনুসারে বলা হয় যে সকল অপরাধীকে

চূড়ান্ত বিচারের দিনে হসরের প্রান্তরে সমবেত হতে হয় ।

১০২ মহম্মদ মনসুরুদ্দিন (সম্পাদিত) হরমণি খন্ড ৯ ঢাকা ১৯৮৮ পৃ ২৬১

১০৩ কে মিত্র সুকুমার সেন, ভি চৌধুরী বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন),কলিকাতা

এস চক্রবর্তী (স ম্পাদিত ) বিশ্ববিদ্যালয় ,একাদশ সংস্করণ ।

১০৪ আবু রশিদ লালন শাহ পৃ ১০ ।

১০৫ T Sarkar Bengal pp 34-43 ,বাংলায় কৃষকদের

অধিকাংশই ছিল মুসলিম এবং মহাজন

ও জমিদাররা অ ধিকাংশই ছিলেন হিন্দু।

১০৬ আলম প্রাগুক্ত পৃ ১০

১০৭ Wadia and Merchant op.cit p 55

সেন ,রহমান প্রাগুক্ত

১০৮ জাহাঙ্গীর দুদু শাহ পৃ ১৩০

১০৯ আলম প্রাগুক্ত ,কবিয়ালরা তাদের প্রতিপক্ষের

সঙ্গে কবির লড়াই করত শ্রোতাদের

সম্মুখে।

১১০ ঐ তদেব

১১১আলম প্রাগুক্ত পৃ ৪৪

১১২ রহমান প্রাগুক্ত পৃ ৪৬

১১৩ ঐ তদেব পৃ ৪৭

১১৪ জসিমুদ্দিন প্রাগুক্ত পৃ ৪৮-৪৯

১১৫ ঐ তদেব পৃ ৪৮

১১৬ ঐ তদেব পৃ ৪৮,৪৯,১৬২ ।

১১৭ ঐ তদেব পৃ ৪৯, ১৬২ ।

১১৮ ঐ তদেব পৃ ৪৯ ।

১১৯ যে হিন্দু দেবতা মৃতদের বিচার করে ।

১২০ আহমেদ শরিফ সম্পাদিত বাউল কবি ফুল ভূষণ ও নাসিরুদ্দিন

পদাবলী ,দিল্লী ১৯৮৮ পৃ ২১৫

১২১ ঐ তদেব পৃ ১০৮

১২২ লুতফর রহমান সম্পাদিত লালন গীতি চয়ন ঢাকা ১৯৮৫ পৃ

৪৬,৪৭।

১২৩ কাদির লোকায়ত সাহিত্য পৃ ৬৭

১২৪ তালিব লালন গীতিকা পৃ ১৩৩ ।

১২৫ দেবী শক্তির উপাসনার কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

১২৬ তালিব প্রাগুক্ত পৃ ১৩৩

১২৭ রিয়াজুদ্দিন আহমদ সঙ্কলিত বাউল ধ্বংস কথা দ্বিতীয় সংস্করণ,

কলকাতা ১৯২৬ ; দ্রষ্টব্য Zalalat

Al fuqara by Nasiruddin and Haziq.

১২৮ তালিব প্রাগুক্ত পৃ ১০১

১২৯ ঐ তদেব

১৩০ ঐ তদেব

১৩১ আবু রশিদ প্রাগুক্ত পৃ ১১

১৩২ তালিব প্রাগুক্ত পৃ ১০৩

১৩৩ রহমান প্রাগুক্ত পৃ ১২৪

১৩৪ ঐ

১৩৫ Karim op.cit p175-176

১৩৬ শরিয়ত হল ইসলামের ধ র্মীয় অনুশাসন

১৩৭ রহমান প্রাগুক্ত পৃ ৩৭

১৩৮ শরীফ প্রাগুক্ত পৃ ১২৯

১৩৯ Ali The Holy Quran p 691

১৪০ আহমদ বাউল ধ্বংস ফতোয়া ; দ্রষ্টব্য

Zalalat al fuqara

১৪১ জাহাঙ্গীর প্রাগুক্ত ৬৩

১৪২ ঐ তদেব পৃ ৯১

১৪৩ Ali op,cit p 691

১৪৪ মহম্মদ মাজিরুদ্দিন মিয়া বাংলা সাহিত্যে রসুল চরিত

ঢাকা ১৯৯৩ অধ্যায় ১-৫

১৪৫ খোন্দকার রিয়াজুল হক মরমী কবি পঞ্জু শাহ ,জীবন ও কাব্য

ঢাকা ১৯৯০ পৃ ২১১ ।

১৪৬ মনসুরুদ্দিন হর মণি পৃ ১০৯ ।এসঙ্গীত গুলি সম্ভবত

দুরবিন শাহের রচিত ।

১৪৭ ধীরেশ ভট্টাচার্য্য ভারতের সংক্ষিপ্ত অ র্থনৈতিক ইতিহাস

মূল ইংরাজি পুস্তক A Concise History of

The Indian Economy, Calcutta 1985 p245

১৪৮ কাদির প্রাগুক্ত পৃ ৬৬-৬৭

১৪৯ ঐ তদেব পৃ ৬৫

১৫০ তালিব প্রাগুক্ত পৃ ২৭৬-২৭৭

১৫১ রহমান প্রাগুক্ত পৃ ৪৬

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

দের

.

\

1. [↑](#endnote-ref-2)